আনন্দমেলা

১৬ জুন ১৯৮২
২·০০
আনন্দবাজার-প্রকাশন

শুরু হল

বুদ্ধদেব গুহর

অ্যাডভেঞ্চার-উপন্যাস

রুআহা

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান আভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের চাই কমপ্লান

একমাত্র কমপ্লান®-এই আছে এদের প্রতিদিনের একান্ত প্রয়োজনীয় ২৩টি খাদ্যগুণ

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের কয়েকটি বিশেষ ধরণের প্রয়োজন থাকে। **কমপ্লান** তাদের দেয় সবচেয়ে সেরা প্রোটিন আর তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাড়ন্ত বয়েসের চাহিদা মেটাতে আরও অন্যান্য ২২টি খাদ্যগুণ। মনে রাখবেন, **কমপ্লান** হ'ল সুপরিকল্পিত আহার যা ডাক্তাররাই বেশী ক'রে সুপারিশ ক'রে থাকেন।

কমপ্লান পাওয়া যায়—চকোলেট, এলাচ-জাফরান ও স্ট্রবেরীর মুখরোচক স্বাদগন্ধে—আর প্লেনও।

বিনামূল্যে ৩২ পৃষ্ঠার পুস্তিকা
"সারা পরিবারের সম্পূর্ণ পুষ্টির জন্যে পরামর্শ"-এর জন্যে অনুগ্রহ করে ৫০ পয়সার ডাক টিকিট সমেত এই ঠিকানায় লিখুন:
পোস্ট ব্যাগ নং ১৯১১৯ (কম্প্) G-260
বম্বে-৪০০ ০২৫।

কমপ্লান®
সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার।

LINTAS GLC/6-1810-BG

আনন্দমেলা

১ আষাঢ় ১৩৮৯ ● ১৬ জুন ১৯৮২ ● ৮ বর্ষ ● ৫ সংখ্যা

পন্যাস

কণ্আহা । বুদ্ধদেব গুহ ৪

জঙ্গলগড়ের চাবি । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৫৫

ল্প

ঘাতক । পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৯

রবারের জঙ্গলে বাঘ । সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩

তিকথা

বসু-বাড়ি । শিশিরকুমার বসু ১৮

মণকাহিনী

নিউ ইয়র্ক । কৃষ্ণা বসু ৩৬

দ্য ধাঁধা

ভুতুড়ে প্রজাপতি ১৭

ছেলেটা । বিমল দত্ত ১১

শিজ্যে বসতে লক্ষ্মী । অভীক বসু ৪৭

লোয়াড়ের আত্মকথা

উইং থেকে গোল । পি. কে. ৪৫

ত্রকাহিনী ও কমিক্স

সদাশিব ২৮, রোভার্সের রয় ৩০, টিনটিন

টারজান ৬০, গাবলু ৬১, ৬৪, বাঘা ৬৫

খলাধুলো

সুরজিৎ সিংয়ের পুরোপাতা রঙিন ফোটো

হকি-তারকার বিদায় । মণি শর্মা ৩২

লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরি । সুব্রত সিংহ ৩৩

টস জিতে ফীল্ডিং । অশোক রায় ৩৪

লখাপড়া

বাংলা বলো । বাচস্পতি ৬২

সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৬৩

ন্যান্য আকর্ষণ

একটি গানের শতবর্ষ মোহিত রায়

ছবির মজা ২৭, ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৫

তোমাদের পাতা ৪০, আঁকো-শেখো

চ্ছদ চিত্রজিৎ ঘোষ

পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

নন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে সাংপাদিত্য রায় কর্তৃক প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং নন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত দাম দু' টাকা

ন মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা

সনালের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত বিদ্যালয় পত্রিকা।

দারুণ খবর

আনন্দমেলা

আগামী সংখ্যায় (৩০ জুন)
শুরু হচ্ছে
বিশ্ববিখ্যাত রঙিন
কমিক্স

ফ্ল্যাশ গর্ডন

মহাকাশ অভিযান নিয়ে
রোমাঞ্চকর এই
চিত্রকাহিনী ধম থেকেই

পড়তে থাকো

ধারাবাহিক উপন্যাস

রুআহা

বুদ্ধদেব গুহ

বাড়ি ফিরতেই মা বললেন, "তোকে ঋজু ফোন করেছিল।"

"কিছু বলেছে?"

"তোকে ফোন করতে বলেছে।"

সঙ্গে সঙ্গে বই-খাতা ফোনের টেবিলেরই এক পাশে নামিয়ে রেখে ফোন করলাম।

একবার বাজতেই ফোনটা ধরল ঋজুদা। বলল, "কে রে? রুদ্র?"

"হ্যাঁ। ফোন করেছিলে কেন?"

"মুলিমালোয়া থেকে বিষেণদেওবাবু এসেছেন। আমার এখানেই আছেন। ভানুপ্রতাপ অ্যারেস্টেড। জামিন পায়নি। যেভাবে পুলিশ কেস সাজিয়েছে প্রমাণ-সাবুদ দিয়ে, তাতে ফাঁসি না-হলেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অবধারিত।"

বললাম, "আহা! এখন যেন দুঃখ হচ্ছে তোমার! কী?"

"ভানুপ্রতাপ তো তোরই সমবয়সী ছিল। দুঃখ কি আর তোরই হচ্ছে না?"

"জানি না।"

"বিষেণদেওবাবু তোকে দেবার জন্যে ওঁর গ্রীনার বন্দুকটা আর একটা পয়েন্ট-টু-সেভেন-ফাইভ রাইফেলও নিয়ে এসেছেন। বলতে গেলে, একেবারেই নতুন। লাইসেন্স করাতে হবে তারপর বলল, "শোন্, আজকে রাতে আমার এখানে খাবি তুই। আরও একটা ভীষণ খবর আছে।"

"কী?"

"খবর পেলাম, ভুষুণ্ডাকে নাকি পুব-আফ্রিকার তান্‌জানিয়ার আরুশা শহরে দেখা গেছে। আমার খোঁড়া-পায়ের বদলা নেবার সময় এসেছে। আবার গুণ্ডনোগুম্বারের দেশে যেতে হবে। বুঝেছিস?"

"সত্যি?" আমি খুব উত্তেজিত গলায় বললাম। "কবে যাচ্ছি আমরা?"

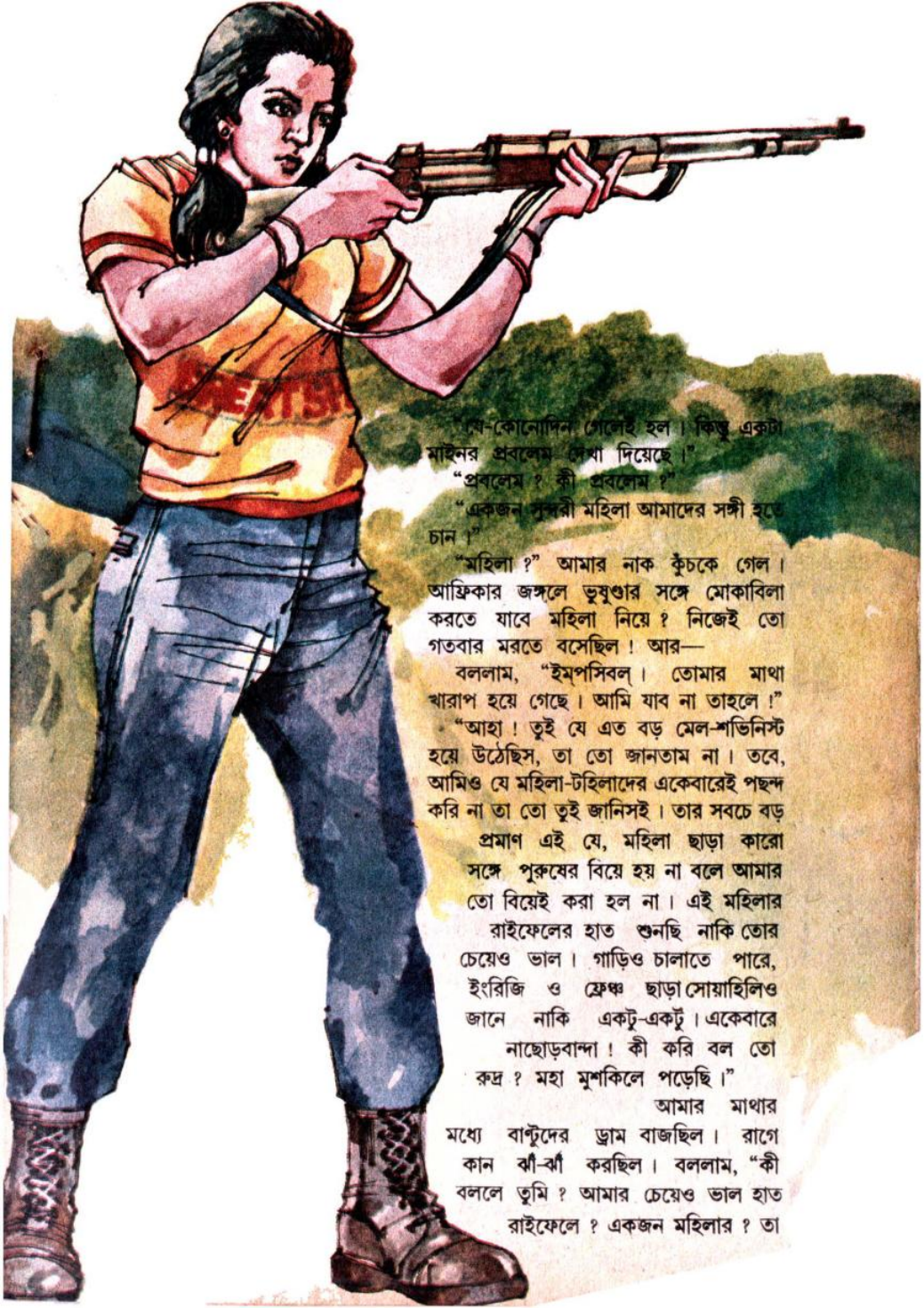

"যে-কোনোদিন গেলেই হল। কিন্তু একটা মাইনর প্রবলেম দেখা দিয়েছে।"

"প্রবলেম ? কী প্রবলেম ?"

"একজন সুন্দরী মহিলা আমাদের সঙ্গী হতে চান।"

"মহিলা ?" আমার নাক কুঁচকে গেল। আফ্রিকার জঙ্গলে ভুষুণ্ডার সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাবে মহিলা নিয়ে ? নিজেই তো গতবার মরতে বসেছিল ! আর—

বললাম, "ইম্পসিবল্। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি যাব না তাহলে !"

"আহা ! তুই যে এত বড় মেল-শভিনিস্ট হয়ে উঠেছিস, তা তো জানতাম না। তবে, আমিও যে মহিলা-টহিলাদের একেবারেই পছন্দ করি না তা তো তুই জানিসই। তার সবচে বড় প্রমাণ এই যে, মহিলা ছাড়া কারো সঙ্গে পুরুষের বিয়ে হয় না বলে আমার তো বিয়েই করা হল না। এই মহিলার রাইফেলের হাত শুনছি নাকি তোর চেয়েও ভাল। গাড়িও চালাতে পারে, ইংরিজি ও ফ্রেঞ্চ ছাড়া সোয়াহিলিও জানে নাকি একটু-একটু। একেবারে নাছোড়বান্দা ! কী করি বল তো রুদ্র ? মহা মুশকিলে পড়েছি।"

আমার মাথার মধ্যে বাণ্টুদের ড্রাম বাজছিল। রাগে কান ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। বললাম, "কী বললে তুমি ? আমার চেয়েও ভাল হাত রাইফেলে ? একজন মহিলার ? তা

তো তুমি বলবেই। ওয়াণ্ডারাবোদের হাত থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে আনলাম আর তুমি এ-কথা বলবে না! তুমি আজকাল সত্যি খুবই অকৃতজ্ঞ হয়ে যাচ্ছ।"

মনে হল, একটু চাপা হাসি হাসল ঋজুদা। বলল, "আহা! চটছিস কেন? তুই অ্যাপ্রুভ না-করলে তো আর সে আমাদের সঙ্গে যেতে পারছে না। আমি তাকে বলেই দিয়েছি যে, তুই-ই হলি ডিরেকটর অব অপারেশানস। তোর কথাই শেষ কথা। তুই-ই আমার মালিক।"

"আহা! এমন গ্যাস দিতে পারো তুমি!"

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললাম, "ভট্‌কাই বেচারার কত যাবার ইচ্ছা ছিল।"

"ও তো রাইফেল-বন্দুক ধরতে পর্যন্ত পারে না। ওর জীবনের দায়িত্ব কে নেবে? তুই? ভট্‌কাইকে নিয়ে যাব তখনই, যখন অ্যালবিনোর মতো কোনো রহস্য-টহস্য ভেদ করার ভার পড়বে আবার আমাদের উপর। ভট্‌কাই বর্ন্ গোয়েন্দা, তোরই মতো। ভট্‌কাইকে তালিম-টালিম দিয়ে তোর চেলা বানিয়ে ফ্যাল্। তারপর—"

আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেছিল মহিলার কথা শুনে। বললাম, "নাম কী সেই মহিলার? বয়স কত?"

"বলছি, বলছি, সবই বলছি। বয়সে তোর চেয়ে সামান্য ছোট, দেখতে একেবারে মেমসায়েবের মতো। আর নাম হচ্ছে তিতির।"

"তিতির? মানে? মডার্ন হাই স্কুলের? তাকে তো আমি খুবই চিনি। প্রযত সেনের বোন? সে কোত্থেকে এসে ভিড়ে গেল তোমার কাছে? যাব্বাবা। মহা ন্যাকা, নাক-উঁচু মেয়ে। না, ঋজুদা। তাকে সঙ্গে নিলে আমিই যাব না।"

"আঃ। এত কথা পরেই হবে'খন। তুই আয়ই না সন্ধেবেলা।"

বলেই বলল, "রুদ্র, গদাধর তোকে জিজ্ঞেস করছে, কী রান্না করবে? কী খাবি?"

আমি রেগে বললাম, "জানি না। খাব না।" মেয়ে! আফ্রিকার জঙ্গলে মেয়ে!

"দেরি করিস না। সাতটার মধ্যে আসিস কিন্তু, আজকাল তো রোজই ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে বিকেলের দিকে।"

বলেই ফোন ছেড়ে দিল ঋজুদা।

মা আমার উত্তেজনা লক্ষ করেছিলেন। বললেন, "কোন্ তিতির?"

"মডার্ন গার্লস স্কুলের ভারী নাক-উঁচু মেয়ে একটা। দ্যাখো-না, ঋজুদার মাথার গোলমাল হয়েছে। মেয়ে-ফেয়ে নিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে যাবে। ভুষুণ্ডার গুলি খেয়ে নিজেই একেবারে গুলিখোর হয়ে গেছে। মেয়েরা—"

মা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "বীরপুরুষ, আমিও কিন্তু মেয়ে। বীরপুরুষের মা। মেয়ে বলে কি মানুষই নয় তিতির? আমি ওর কথা শুনেছি নীপাদির কাছে। সবদিক দিয়ে খুবই ভাল মেয়ে। তার মা-বাবার আপত্তি না থাকলে তোর আপত্তির কী? মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কোন্ দিক দিয়ে ছোট?"

আমি হাল ছেড়ে দিলাম। গভীর চক্রান্ত। ঘরে-বাইরে অতি সুগভীর চক্রান্ত চলেছে আমার বিরুদ্ধে।

সাতটা নাগাদ গিয়ে ঋজুদার ফ্ল্যাটে পৌঁছতেই অ্যাল্‌বিনোর মালোয়ামহল-এর বিষেণদেওবাবু আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, "আও বেটা, মেরে লাল।"

তিতির আমাকে দেখে বলল, "হাই! রুদ্র।"

দেখলাম, একটা রঙ-চটা জিনস্ পরেছে। উপরে হলুদ গেঞ্জি। মাথায় পনি-টেইল্।

আমি উদার হাসি হেসে বললাম, "ভাল আছ? প্রযতদা কেমন?"

জবাব না দিয়ে ও বলল, "তুমি কেমন আছ বলো। ডিবেটে হেরে গিয়ে খুব রেগে রয়েছ বুঝি এখনও?"

ঋজুদা কথা ঘুরিয়ে বলল, "আমাদের সকলেরই এক্ষুনি একবার বেরোতে হবে তিতির। আমার ডিরেক্টর অব অপারেশানস্ তোমার রাইফেল ও পিস্তল শুটিং-এর পরীক্ষা নেবেন।"

"আমি?" বললাম, লজ্জায় মরে গিয়ে।

ঋজুদার মতো অন্যকে বে-আব্রু বে-ইজ্জত করতে আর কেউই পারে না।

ঋজুদা গদাধরকে বলল, "গদাধর, রাইফেল, পিস্তল সব গাড়িতে তোল্। বিষেণদেওবাবু যে রাইফেলটা এনেছেন, সেটাও।"

গদাধর ভিতরে গেল।

ঋজুদা দেওয়ালে ঝোলানো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটাকে দেখিয়ে বিষেণদেওবাবুকে বললেন, "বিষেণদেওজি, মুলিমালোয়ার অ্যাল্‌বিনো বাঘ রুদ্রবাবু মারতে পারেনি ঠিকই, কারণ বাঘ তো সেখানে ছিলই না; কিন্তু এই বাঘটি ওরই মারা। সুন্দরবনের ম্যান-ইটার। গদাধরের বাবাকে এই বাঘই খেয়েছিল, বনবিবির বনে।"

বিষেণদেওবাবু স্তুতির চোখে তাকালেন আমার দিকে।

চোখের আড়ালে দেখলাম, তিতির সেনের চোখেও অ্যাপ্রিসিয়েশান ঝিলিক মারছে। ভাবলাম, মেয়েটাকে যতখানি নাক-উঁচু ভাবতাম, ততখানি সত্যি-সত্যি না-ও হতে পারে।

তিতির আমার দিকে প্রশংসার চোখে চেয়ে বলল, "সত্যি। কী সাহস তোমার রুদ্র। আই অ্যাড্‌মায়ার য়ু।"

গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম, "এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে রাতের বেলা শুটিং কম্‌পিটিশান করতে কোথায় যাবে ঋজুদা? চাঁদও নেই; অন্ধকার, তার উপর এই দুর্যোগ।"

ঋজুদা বলল, "আমাদের ভুষুণ্ডা-চাঁদ তো তোমাকে উজ্জ্বল চাঁদনি রাতে দেখা না-ও দিতে পারে? যাচ্ছি, জেঠুমণির কোন্‌চৌকির খামারবাড়িতে, ডায়মণ্ডহারবার রোডে। ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যেই ফিরে আসব।"

জোকা পেরিয়ে একটু গিয়েই ডান দিকে কোন্‌চৌকিতে ঋজুদার জেঠুমণির খামারবাড়ির সামনে পঁচিশ একরের ধানখেত। চারপাশে বিরাট গভীর নালা। বাঁধের মতো আছে। প্রায় একশো গজ দূরে একটা ঝাঁকড়া পেয়ারা গাছে চারকোনা টিনের ছোট-ছোট বাক্সর উপর সাদা রঙ করে দড়ি দিয়ে ঝোলানো। প্রবল ঝোড়ো হাওয়ায় ডালপালা উথাল-পাতাল করছিল। টিনগুলোও পাগলের মতো নাচানাচি করছিল। দূর থেকে মনে হচ্ছিল, কতগুলো সাদা বিন্দু।

"প্রথমে আমি।" ঋজুদা বলল। বলেই, থ্রী-টু পিস্তলটা খাপ থেকে বার করে নিয়ে পরপর তিনটি গুলি করল ওয়াড্‌-কাটার দিয়ে। একটিও লাগল না।

আমি বুঝলাম, ঋজুদা ইচ্ছে করেই মিস্ করল। তার মানে, আফ্রিকাতে তিতিরকে নিয়ে যাবেই। তিতির মিস্ করলে বলবে, 'যা দুর্যোগ। অন্ধকার। আমিই পারলাম না, তা ও কী করে পারবে।' কী চক্রান্ত। তাহলে আর মিছিমিছি এসব ঢং কেন?

"এবার রুদ্র।" ঋজুদা বলল। "কী দিয়ে মারবি? বিষেণদেওবাবুর নতুন প্রেজেন্ট টু-সেভেন্টিফাইভ রাইফেল দিয়েই মার। তোকে হ্যাণ্ডিক্যাপ্ দেব—নতুন রাইফেল—প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাসনি। রাইফেল জিরোয়িং করাও হয়নি। ওকে? বাট্ ওন্‌লি থ্রী শটস্। মাত্র তিনটি গুলি।"

রাইফেলটা তুলে নিলাম আমি। গুলি ভরলাম ম্যাগাজিনে। কোথাও কোনো আলো নেই। খামারেরও সব আলো নিভোনো। শেডটার নীচে দাঁড়িয়েও মুখে-চোখে ঝোড়ো হাওয়ায় জলের ঝাপটা লাগছে। টিনগুলো ক্রমাগত দুলছে। প্রথম গুলি, মিস্। দ্বিতীয় গুলি করতেই দন্‌দন্ করে একটা টিন কথা বলল। তৃতীয় গুলি মিস্।

ঋজুদা বলল, "ওয়েল ডান্। ভেরি ওয়েল ডান্, ইনডিড্। এই ওয়েদারে, অন্ধকারে।"

তারপর তিতিরকে বলল, "তিতির, তোমার রাইফেলটা দিয়েছে তো গদাধর?"

"হুঁ।"

আমি বললাম, "কী রাইফেল?"

"পয়েন্ট টু-টু।" তিতির বলল।

বললাম, "ওঃ, অনেক লাইট-রাইফেল। এ তো খেলনা।"

তিতির সঙ্গে-সঙ্গে কথাটার মানে বুঝল। বুঝেই, ঋজুদার দিকে তাকাল। বলল, "ঋজুকাকা, আমার রাইফেলে মারা অনেক সহজ হবে। রুদ্র যে রাইফেলে মারল, আমিও সেই রাইফেলেই মারব—আমার কাছেও তো এটা নতুন।"

ঋজুদা বলল, "দ্যাটস্ ভেরি স্পোর্টিং অব হার।"

আমি আমার নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হলাম। খুশিও হলাম এই কারণে যে, এই রাইফেল দিয়ে তিতির একটি গুলিও লাগাতে পারবে না। পয়েন্ট টু-টু রাইফেল, ছোটবেলায় আমাদের সাউথ-ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের ক্যাপ্টেন বসু-ঠাকুর থুতনির উপর বসিয়েই বলে-বলে কাক মারতেন।

তিতির রাইফেলটা একটু নেড়েচেড়ে দেখে নিল। তারপর তুলে এইম্ করল। দেখলাম, চমৎকার হোলডিং। তারপর, আমি যা করিনি, ফ্লাইং শট্ নেবার সময় যেমন ব্যারেল সুইং করে মারতে হয়, তেমনভাবে দু-একবার শ্যাডো

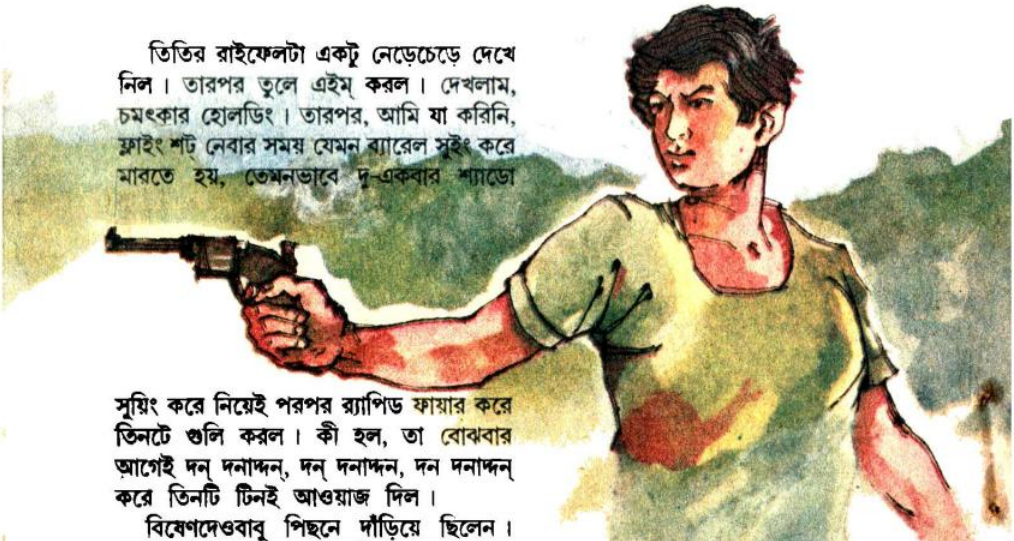

সুয়িং করে নিয়েই পরপর র‍্যাপিড ফায়ার করে তিনটে গুলি করল। কী হল, তা বোঝবার আগেই দন্ দনাদ্দন্, দন্ দনাদ্দন, দন দনাদ্দন্ করে তিনটি টিনই আওয়াজ দিল।

বিষেণদেওবাবু পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলে উঠলেন, "শাব্বাশ, শাব্বাশ! শাব্বাশ বেটি।"

আমার গলার কাছে লজ্জা ও অপমান এবং হেরে-যাওয়ার গ্লানি দলা পাকিয়ে উঠল। তবুও মুখ দিয়ে নিজের অজান্তেই র‍্যাপিড-ফায়ারের মতো বেরিয়ে গেল "কনগ্রাচুলেশনস্!"

তিতির বলল, "রুদ্র, আমি শুনেছি ঋজুকাকার কাছে, তুমি আসলে আমার চেয়ে অনেক ভাল মারো। আমার আনতাবড়ি গুলিগুলো আজ বাই-চান্স লেগে গেছে।"

ঋজুদা আর একটুও সময় নষ্ট না করে, পাছে আমি আর কোনো আপত্তি তুলি, তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "তাহলে তিতির যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে? কী বলো ডিরেক্টর?"

আমি বললাম, "আমি তো আর পরীক্ষা নিতে চাইনি। তুমিই এসব করলে, এখন আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছ!"

ঋজুদার ফ্ল্যাটে আমরা খেতে বসলাম, বিষেণদেওবাবুর সঙ্গে অনেক গল্প-টল্প করার পর। বিষেণদেওবাবু বললেন, "তোমরা আফ্রিকাতে যাবার আগে তিতির-বেটিকে আমার পয়েন্ট থ্রী-টু কোল্ট পিস্তলটা পাঠিয়ে দেব মুলিমালোয়া থেকে। ভানুপ্রতাপই নেই। আমি আর অতগুলো রেখে কী করব। শিকার তো আমি ছেড়েই দিয়েছি কবে। ঋজুবাবু, আপনি শুধু ওর লাইসেন্সের বন্দোবস্তটা করে রাখবেন।"

ঋজুদা বলল, "তিতির অল-ইণ্ডিয়া রাইফেল শুটিং কম্পিটিশানে ফার্স্ট হয়েছিল। আর্ল-রবার্ট ক্যাডেট-ট্রফিও ও পেত, জ্বর না হলে। অতএব লাইসেন্স কোনো প্রবলেম নয়।"

তিতির বলল, "আমার ছোট দাদু ওয়েস্ট বেঙ্গলের হোম-সেক্রেটারি। লাইসেন্স পেতে অসুবিধা হবে না।" বলেই, রান্নাঘরে গিয়ে আমাদের জন্যে এমন নরম আর ফার্স্ট ক্লাস ওমলেট বানিয়ে আনল মাশরুম, চিকেন, কাঁচা পেঁয়াজ, ট্যোম্যাটো আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে যে, খেয়ে অবাক হয়ে গেলাম।

বিষেণদেওবাবু বললেন, "স্ট্রিক্ট ভেজিটারিয়ানও ঐ ওমলেট খাবে। ভারী উম্‌দা বানালে বেটি!"

ঋজুদা বলল, "গদাধর, ইমপ্রুভ কর্, রান্না শিখে নে; নইলে, তোর চাকরি যাবে।" তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, "মিস্টার ডিরেক্টর সাহেব, তাহলে, যে-রাঁধে সেও যে কভি-কভি চুল বাঁধতে পারে, এ-কথা স্বীকার করছ?"

ফেঁসে গেলাম। ঋজুদার কাজই এই।

মুখে বললাম, "কী বলছ বুঝতে পারছি না।"

বলেই হেসে উঠলাম। হাসতেও যে এত কষ্ট হয়, তা আমি আগে কখনও জানিনি।

(ক্রমশ)

ছবি অনুপ রায়

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ঘাতক

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

১৯৮০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর দমদম এয়ারপোর্ট থেকে এক মাইল দূরে যশোর রোডের কাছে অভিনেতা শীতাংশুমোহন পাল এক মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হন। শীতাংশুমোহন খুব বড় অভিনেতা ছিলেন না। সিনেমায় বেশ কিছু সাইড রোলে অভিনয়ের পরে তিনি পুরোপুরি মঞ্চে চলে আসেন। মঞ্চেও তিনি খুব একটা সুবিধে করতে পারেননি। শেষের দিকে মুন থিয়েটারে তিনি ডুপলিকেট হিসেবে কাজ করতেন। পেশাদারি মঞ্চে দু-তিনজন করে ডুপলিকেট থাকেন। তাঁদের কাজ রোজ থিয়েটারে হাজিরা দেওয়া। যদি কোনো শিল্পী অনুপস্থিত হন তার বদলে সেই রোলে তাঁরা চটপট নেমে যান।

জীবনী লেখার মতো কোনো নামী চরিত্র শীতাংশুমোহন নন। ডুপলিকেট হিসেবে প্রখ্যাত নায়কের অনুপস্থিতিতে সেই নায়কের ভূমিকায় তিনি বহুদিন অভিনয় করেছেন। কিন্তু তিনি যে কোনোদিন নায়ক হতে পারবেন না, এটা তিনি জানতেন। একজন ব্যর্থ শিল্পী শীতাংশুমোহন পালের জীবন-কাহিনী আমি কখনই লিখতে বসতাম না, যদি না তাঁর জীবনের শেষ পর্বের এক শোচনীয় পরিণতির মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়তাম। আজ আমার মনে হচ্ছে, তাঁর মৃত্যুর জন্য আমিই বোধহয় দায়ী।

শীতাংশু পালের দুর্ঘটনার খবরটি শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতাল থেকে একজন ডাক্তার আমাকে ফোন করে জানিয়েছিলেন। রাত তখন বারোটা। অপিস থেকে ফিরে সবে ঘুমোতে গিয়েছি। এমন সময় ফোন। "পি জি হাসপাতাল থেকে বলছি। অভিনেতা শীতাংশু পাল দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে এসেছেন। এখনও জ্ঞান আছে তাঁর। আপনার সঙ্গে কতগুলো কথা বলতে চান। বার বার করে

সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী !

সুপার রিন-এর নিয়মিত ব্যবহার আপনার জামাকাপড়ের চেহারাকে পাল্টে এমনই চমকদার করে তুলবে যা দূর থেকেও নজরে পড়বে !

সুপার রিন অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট পাউডার বা বারে কাচা কাপড়ের চেয়ে অনেক বেশী ঝকঝকে সাদা করে ধোয়। কারণ, সুপার রিন-এর শুভ্রতা আনার শক্তি যে অনেক বেশী !

চাক্ষুষ প্রমাণ করে নিন :

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট ধোয়া

সুপার রিন-এ ধোয়া

সুপার রিন-এ আছে শুভ্রতা আনার অনেক বেশী শক্তি !

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RIN.40-1810 BG

বলছেন আপনার কথা। আপনি এমার্জেন্সিতে চলে আসুন।"

"কে বলছেন আপনি?"

"আমি হাউস সার্জেন, ডাঃ অমিত নাগ।"

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আবার ফোন করলাম পি জি এমার্জেন্সিতে। ডাঃ নাগ নিজেই ধরলেন। আমি বললাম, "যদি ট্যাক্সি পাই, তাহলেই যেতে পারব। নয়তো কাল সকালে।"

ডাঃ নাগ বললেন, "জানি না কাল সকাল পর্যন্ত শীতাংশুবাবু বেঁচে থাকবেন কি না।"

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ির সামনে রাস্তার মোড়ে মাঝেমধ্যে এ-সময় ট্যাক্সি থাকে। আজ ভাগ্যক্রমে একটি ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। ট্যাক্সি বলল, গড়িয়াহাট গ্যারেজে যাবে, পি জি যেতে পারবে না। দশ টাকা বখশিস কবুল করায় অবশেষে রাজি হল ট্যাক্সি। ট্যাক্সি ছুটে চলল পি জি-র দিকে।

শীতাংশু পালের সঙ্গে আমার আলাপ বেশিদিনের নয়। বছরখানেক আগে 'প্রদীপের নীচে' বলে একটি ফীচারে চিত্র ও মঞ্চ জগতের উপেক্ষিত শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে লিখছিলাম। আমার সঙ্গে সেই সূত্রে শীতাংশু পালের আলাপ। রঙ্গজগতের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত রবি বসু আমাকে শীতাংশু পালের সন্ধান দিয়ে বলেছিলেন, "এ-জগতে নাম করাটা বিরাট ভাগ্য মশায়। নয়তো এই শীতাংশু পালকেই দেখুন না। মহেন্দ্র গুপ্তের ডুপলিকেটেও অভিনয় করেছেন শীতাংশু পাল। কিন্তু দর্শকেরা ধরতে পারেনি, আসল না নকল। আর মুন থিয়েটারে ডালিমকুমার যেদিন যেদিন থাকেন না সেদিন চরিত্রহীন-এ সতীশের পার্টটা ওই শীতাংশু পালই করেন। আমি তো বলব, ডালিমকুমারের চেয়ে অনেক ভাল রোল করেন শীতাংশুবাবু, কিন্তু তিনি কোনোদিন স্বাধীনভাবে একটা রোল করার সুযোগ পেলেন না।"

ডালিমকুমার আমার অনেকদিনের বন্ধু। পরে শীতাংশুবাবুর সঙ্গেও আলাপ হল। বছর-চল্লিশেক বয়স। চেহারা এক কালে বেশ ভালই ছিল। কিন্তু দারিদ্র, হতাশা, অপমান আর গ্লানির ছাপ সর্বাঙ্গে। তাঁর জীবন-কাহিনী পাক্ষিক রূপমায়া কাগজে প্রকাশ করেছিলাম। সে কাহিনীর মধ্যে যাব না। তারপর থেকে

এই ছেলেটা

বিমল দত্ত

এই ছেলেটা, ভেলভেলেটা
কী খাচ্ছিস ? চুইংগাম ?
বলতে পারিস আমার নাম ?
কী বললি, হ্যাংলা হুতুম ?
এক চড়ে তোর মুণ্ডু নিতুম।
কিন্তু এখন সময় কম—
তাই চলে যাই জোর কদম্।
রাইট্ লেফট্, লেফট্ রাইট্...
আরেক সময় করব ফাইট্।

শীতাংশুবাবু মাঝে-মাঝে আসতেন আমার বাড়ি। থিয়েটারের পাশ দিয়ে যেতেন। শুধু মুন থিয়েটার নয়, থিয়েটার-পাড়ায় সব থিয়েটারের সঙ্গেই ভাল যোগাযোগ ছিল শীতাংশুবাবুর। তাঁর দেওয়া পাশে আমরা প্রায় সব চলতি থিয়েটারই দেখেছি।

এই তো কিছুদিন আগে আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক কমল ঘোষ আমার বাড়িতে বসে ছিলেন। সে সময় শীতাংশুবাবুর আবির্ভাব ঘটল। মুন থিয়েটারে নতুন নাটক চন্দ্রগুপ্ত হচ্ছে। আমাকে সপরিবারে দেখার আমন্ত্রণ জানাতে এসেছেন শীতাংশুবাবু। আমি শীতাংশুবাবুর সঙ্গে কমলবাবুর পরিচয় করিয়ে দিলাম। বললাম, "কমলবাবু ফরেন সার্ভিসে আছেন। সম্প্রতি দুমাসের ছুটিতে কলকাতায় এসেছেন। ওঁকে আমন্ত্রণ জানান। খুব রসিক লোক।"

শীতাংশুবাবু বললেন, "আপনিও আসুন। আমাদের প্রপ্রাইটর চাইছেন নাটকটা পাঁচজন জ্ঞানী-গুণী মানুষ দেখুক।"

কমলবাবু বললেন, "না-না, আমি আর নাটক দেখতে যাব না।"

অমর চিত্রকথার আর এক অবদান

দেশ বিদেশের
রোমাঞ্চকর কাহিনী
পশু পক্ষীদের
জীবন আলেখ্য
জ্ঞান বিজ্ঞানের
অফুরন্ত ভাণ্ডার
টিংকল্ ছলা কলা

টিংকল্

চিত্রকথার মাধ্যমে
ছোটদের শিক্ষণীয়
একমাত্র
মাসিক পত্রিকা

USP

প্রকাশক
ইণ্ডিয়া বুক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড
৪১২ তুলসীয়াত্রি চেম্বার্স বোম্বাই-৪০০ ০২৯

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের একমাত্র পরিবেশক
উচ্চারণ ২ ১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

আমি বললাম, "নাটকের ওপর আপনার এত অরুচি কেন কমলবাবু?"

কমলবাবু বললেন, "আমি নাটক দেখতে গেলেই দেখেছি একটা না একটা অঘটন ঘটে। গত এক মাসে দুটো নাটক দেখেছি কলকাতায়। তার অভিজ্ঞতা কিন্তু ভয়ংকর।

"প্রথম নাটকটি দেখতে গিয়েছিলাম পারিজাত থিয়েটারে। শান্তনু হাজরা নাট্য পরিচালক, অভিনেতা শান্তনু হাজরার কথা বলছি, উনি যখন লণ্ডন যান তখন ওখানেই ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ। আমি কলকাতায় এসেছি শুনে উনি আমাকে ও আমার স্ত্রীকে জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন ওঁদের নাটক দেখার জন্য।

"হলে বসেছি। একদম সামনের সীটে বক্সে আমাদের জায়গা দেওয়া হয়েছে। অভিনয় শুরু হবার কিছুক্ষণ আগেই দু কাপ চা এসে গেল। এদিকে নাটক আরম্ভ হয়ে গেছে। আমরা চা নিয়ে একটু বিব্রত হলাম। দেখি মঞ্চে এসে নায়কের রোলে ঢুকেছেন শান্তনু হাজরা। তাঁর চোখে পড়ে গেছে আমাদের হাতে চায়ের কাপ। তিনি মঞ্চ থেকে পার্ট করতে করতে নিচুস্বরে কাকে যেন বললেন, 'চায়ের কাপটা হাত থেকে নিয়ে আয় বেয়াদপ!' একটু পরেই একজন নিচু হয়ে এসে চায়ের কাপ নিয়ে গেল আমাদের হাত থেকে।

"নাটক দেখে ধন্যবাদ দিয়ে চলে এসেছি। হঠাৎ তিনদিন পরে কাগজে দেখলাম, শান্তনু হাজরা স্ট্রোকে মারা গেছেন। শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু তখনও কিছু বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম এটি স্বাভাবিক মৃত্যু। কিন্তু ভয় পেয়ে গেলাম দ্বিতীয়বারের ঘটনায়।

"ব্যালেরিনা মঞ্চে আমার পরিচিত এক অভিনেতা ও পরিচালক একটি জনপ্রিয় নাটক নামিয়েছেন। তিনি আমায় আমন্ত্রণ জানালেন নাটক দেখার। নাটক দেখলাম। ঠিক সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। প্রথম সারিতে আমি ও আমার স্ত্রী বসে। চা এল। পর্দা উঠল। চা খেতে খেতে নাটকটি দেখলাম। বেশ উপভোগ্য নাটক। অভিনেতা-পরিচালককে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। তার তিনদিন পরে খবরের কাগজে দেখলাম সেই অভিনেতা আত্মহত্যা করেছেন।"

গল্প শুনে আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম। "বেশ গল্প ফেঁদেছেন তো মিস্টার ঘোষ। আপনি দেখছি আমার মতো লেখক হলে বেশ সফল হতেন।"

মিস্টার ঘোষ বললেন, "না সন্দীপবাবু, এই দুটি দুর্ঘটনা ঘটার পরে আমি বেশ তলিয়ে সব কিছু ভাবতে শুরু করেছি। মনে পড়ছে সিঙ্গাপুরে পোস্টেড থাকার সময় একবার আমরা ভারতীয় দূতাবাস থেকে দিল্লির এক ভারতীয় ব্যালে টীম আনিয়েছিলাম। ওই টীমের যিনি পরিচালিকা তাঁর নামটা আমি বলতে চাই না। তাঁর সঙ্গে আমার হৃদ্যতার সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। তাঁর অনুষ্ঠানের প্রথম দিনও আমি ও আমার স্ত্রী প্রথম সারিতে বসেছিলাম। ওখানেও ইনটারভ্যালে কফি দেওয়া হয়েছিল। তাড়াতাড়ি শো শুরু হওয়াতে আমরা কফির গেলাস নিয়েই আমাদের আসনে বসে পড়ি। এখন সেসব কথা মনে পড়ছে।

"ভদ্রমহিলা তাঁর ট্রুপ নিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে চলে যান জাপান। জাপানে তাঁর হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু-সংবাদে আমি খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। কিন্তু সে-সময় কখনও ভাবিনি আমার অভিনয় দেখার সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর কোনো যোগ আছে।

"এরপর কলকাতায় আরও দুটো ঘটনা ঘটার পরে আমি এ-নিয়ে পড়াশুনা করতে শুরু করেছি। সম্প্রতি বিশ্বের অলৌকিক কাহিনী বলে একটি বই পড়লাম। তাতে তিনটি কেস-হিস্ট্রি দেওয়া আছে। এক দম্পতি নাকি কোথাও এক পূর্ণিমার রাতে যতজনের সঙ্গে করমর্দন করতেন ততজনই অসুস্থ হয়ে পড়তেন।"

মিস্টার ঘোষের গল্পকে আজগুবি বলে উড়িয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁকে থিয়েটার দেখতে কিছুতেই রাজি করাতে পারেন নি শীতাংশু পাল। আমারও আর চন্দ্রগুপ্ত নাটকটি দেখতে যাবার সময় হয়ে ওঠেনি।

সেদিন শীতাংশু পাল বোধহয় আমার জন্যই বেঁচে ছিলেন। হাসপাতালে ততক্ষণ তাঁর ছেলে ও বউ এসে গেছেন। হাসপাতালে ঢোকার মুখেই ওঁর ছেলের সঙ্গে দেখা। ছেলেটি আমাকে দেখে চিনতে পেরে তাড়াতাড়ি ভেতরে নিয়ে গেল।

"কেমন অবস্থা?"

"বোধহয় বাঁচবেন না। পাঁজর ভেঙে গেছে। প্রচুর রক্ত পড়েছে। মাথার আঘাত গুরুতর।

পিএনবির
গিফ্‌ট চেক

ভেবে দেখুন কতবারই না আপনি এমন উপহার পেয়েছেন বা দিয়েছেন যা হয়ত আপনার মনের মত হয়নি।

অথচ পছন্দসই উপহার দেওয়া আজকাল কতই না সহজ পি.এন.বি.র 11, 21, 31, 51 এবং 101 টাকা মূল্যের গিফ্‌ট চেকের মাধ্যমে।

এই চেকের জন্য বাড়তি খরচ লাগেনা, বরং উপহার দিলে মনের মত জিনিষ কিনে নেয়া যায়।

...এবং আপনার প্রীতির নিদর্শন

PNB/8/B/3

পাঞ্জাব ন্যাশ্‌নাল ব্যাঙ্ক

আপনার কথা বারবার বলছিলেন।"

"কোথায় যাচ্ছিলেন উনি?"

"ফিরছিলেন বারাসাত থেকে। ওখানে মুন থিয়েটারের মালিক বীরেশবাবুর বাগানবাড়িতে গিয়েছিলেন বীরেশবাবুর সঙ্গে। বীরেশবাবুকে রেখে ড্রাইভারের সঙ্গে খালি গাড়িতে ফিরছিলেন। ড্রাইভারও আহত। তবে আঘাত গুরুতর নয়।"

শীতাংশু পালের সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তিনি অতি কষ্টে চোখ খুলে বললেন, "সন্দীপবাবু, আপনাকে আমার পাপের কথা না বলে মরেও আমার শান্তি হবে না।"

"ও কী বলছেন শীতাংশুবাবু। আপনি শান্ত হন, উত্তেজিত হবেন না।"

মৃত্যুশয্যায় শীতাংশুবাবু আমাকে যা বলেছিলেন তাতে আমি চমকে উঠেছিলাম। তিনি বললেন, "আপনার বন্ধু মিস্টার ঘোষের গল্প শোনার পরে আমার মনে একটা বদবুদ্ধি খেলে যায়। ডালিমকুমার —ডালিমকুমারকে আমি হিংসা করতাম। তার অনুপস্থিতিতে তার রোল করে যাচ্ছিলাম আমি। আমার চাণক্য দেখে সমস্ত দর্শক আশ্চর্য হয়ে গেছে। ডালিমকুমারকে না দেখে প্রথমে তারা বিরক্ত হয়ে ওঠে। পরে দেখেছি, আমার অভিনয় দেখার পরে তারা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেছে। অথচ কোনোদিন আমি পুরোপুরি চাণক্যের ভূমিকা পাব না কেন? কেন আমার নামে পোস্টার ছাপা হবে না? কাগজে বিজ্ঞাপন থাকবে না? কী অপরাধ আমার? আমি ঠিক করলাম ডালিমকুমারকে সরিয়ে দিতে হবে। আর তা সম্ভব যদি মিস্টার ঘোষকে একদিন তার অভিনয় দেখাতে নিয়ে আসতে পারি। আমি আমার মালিককে বললাম, যে করে হোক মিস্টার ঘোষকে যদি নিয়ে আসতে পারেন তাহলে তাঁর সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত নাটকটি আমরা বিদেশেও নিয়ে যেতে পারি। আমার মালিক তখন আমার পরামর্শ-মতো ডালিমকুমারকে নিয়ে মিস্টার ঘোষের বাড়ি গেলেন। ডালিমকুমারের অনুরোধে মিস্টার ঘোষ আসতে রাজি হলেন।

"মিস্টার ঘোষ ও মিসেস ঘোষ এলেন। প্রথম সারিতে তাঁরা বসলেন। আমি তাঁদের দু কাপ চা পাঠিয়ে দিলাম। উত্তেজনায় আমি থর-থর করে কাঁপছি। আমি যেন এক গুপ্ত ঘাতকের ভূমিকায় অভিনয় করছি। কিন্তু এদিকে খেয়ালই হয়নি চাণক্যের ভূমিকায় যাঁর অভিনয় দেখার জন্য সমস্ত দর্শক ফেটে পড়ছে সেই ডালিমকুমারই অনুপস্থিত। তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পাঁচ মিনিট—তিন মিনিট—দু মিনিট—না, ডালিমকুমার নেই। তখন আমি কিছু ভাববার আগেই মালিক এসে জোর করে আমার জামা খুলে আমাকে মেক-আপম্যানের সামনে নিয়ে এলেন। ঠিক সময়ই পর্দা উঠল। তারপর চাণক্যের দৃশ্য আসতেই এক ধাক্কায় আমাকে স্টেজে ঠেলে দিলেন আমার মালিক। ঘাতক আজ নিজেই বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে। আমি দেখতে পাচ্ছি সামনের সারিতে বসে মিস্টার আর মিসেস ঘোষ। তাঁদের হাতে ধরা চায়ের কাপ। অভিনয় করতে করতে আমি বললাম, কেউ গিয়ে কাপটা নিয়ে আয়।

"তারপর আর আমার কিছু মনে নেই। আমি চাণক্য তখন, প্রচণ্ড ক্রোধে, হতাশায় কুশাঙ্কুরকে উৎপাটিত করছি দু হাতে।

"তার দু দিন পরেই এই দুর্ঘটনা। আমি আর বাঁচব না সন্দীপবাবু। শুধু বলে যাই আপনাকে, অপরকে হত্যা করার কথা ভেবেছিলাম, সেই পাপ আমাকে এইভাবে গ্রাস করল।"

কিন্তু আমি কী জবাব দেব? ঘাতক তো আমি নিজেই। শীতাংশু জানে না, মিস্টার ঘোষ যে থিয়েটার দেখতে যাচ্ছেন সে-কথা আমি আগেই জানতে পেরেছিলাম। আর ঠাট্টা করে ডালিমকুমারকে বলে ফেলেছিলাম মিস্টার ঘোষের থিয়েটার দেখতে যাবার আগের ইতিহাসগুলো। বলেছিলাম, দেখবেন মশায়, সাবধান। কিন্তু ডালিমকুমার যে সে-কথা শুনে ভয় পেয়ে অভিনয় করতেই আসবে না কে জানত।

বিখ্যাত ইংরেজ লেখক থ্যাকারে বলেছিলেন, "জীবনটা হল একটা আয়না। তুমি যদি তাকে দেখে ভ্রূ কুঞ্চিত করো, সে-ও তা-ই করবে। তুমি যদি সহাস্যে তার প্রতি তাকাও, সে-ও হাসতে হাসতে তোমাকে অভিনন্দন জানাবে।"

ঝরঝরে তরতাজা হ'য়ে উঠুন

একেবারে আলাদা জাতের সাবান লিরিল। সবুজ তরঙ্গ — লেবুর চনমনে সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে হ'তে লিরিল ... স্নানের পর আপনি হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ !

লিরিল
তরতাজা হবার সাবান

লেবুর মত চনমনে তরতাজা

LINTAS LR. 27-1810 BG

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

ভুতুড়ে প্রজাপতি

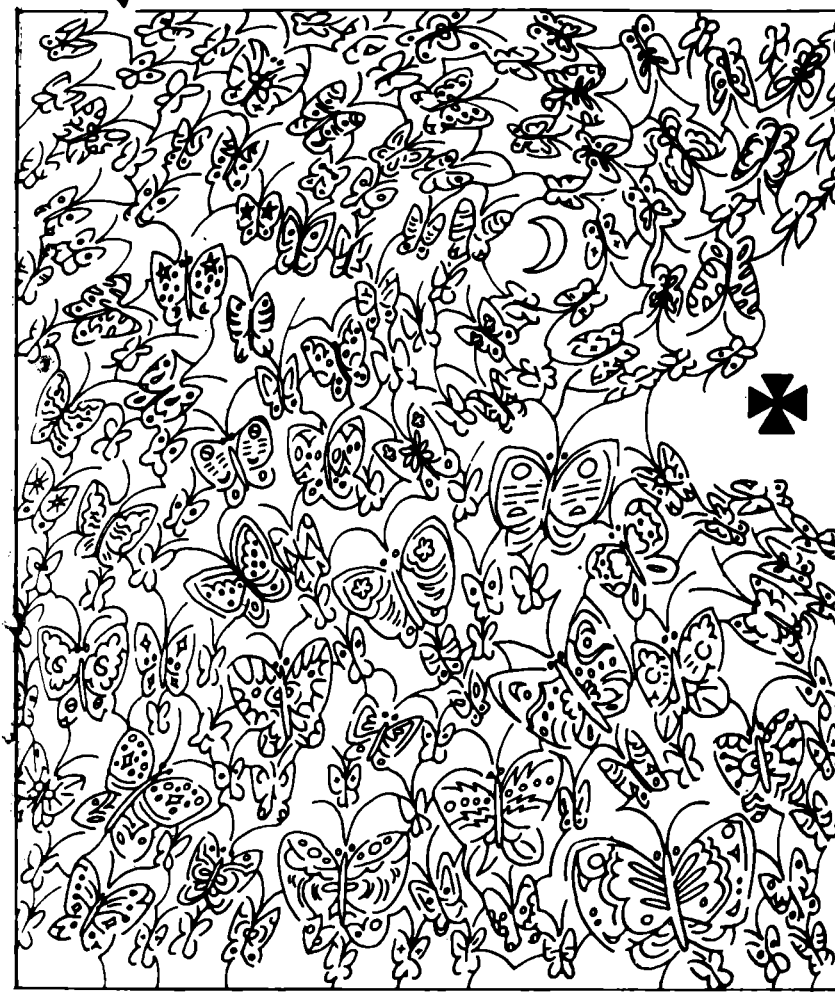

ভুতুড়ে শহরের ধাঁধার কথা মনে আছে তো ? এবারে দিচ্ছি ভুতুড়ে প্রজাপতির ধাঁধা। ভুতুড়েই বটে, নইলে এমনভাবে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে হঠাৎ পথঘাট সব আটকে দেয় ? একেবারে অবশ্য আটকে দেয়নি, ফাঁক-ফোকর আছে ঠিকই। তোমার কাজ হচ্ছে তীর-চিহ্ন-দেওয়া জায়গা দিয়ে ঢুকে তারপর ক্রস-চিহ্ন-দেওয়া জায়গায় বেরিয়ে যাওয়া। ২৪ পৃষ্ঠায় উত্তর দেওয়া আছে, কিন্তু আগেই সেটা না-দেখে বরং নিজেই তোমার পথ খুঁজে নাও।

বসু-বাড়ি

শিশিরকুমার বসু

॥ ৫৪ ॥

১৯৪৩ সালের মার্চ মাস। রেডিওতে বার্লিন থেকে রাঙাকাকাবাবুর বক্তৃতা শুনে কেমন যেন খটকা লাগল। মনে হল যেন পুরানো কোনো রেকর্ড করা বক্তৃতা শুনছি। রাঙাকাকাবাবু প্রতিবার বক্তৃতার প্রথমে যুদ্ধ-পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতেন। তারপর ভারতবর্ষের ভিতরকার আলোচনা করে নিজের মন্তব্য পেশ করতেন, এবং শেষে স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য তিনি কী করছেন তার একটা আভাস দিয়ে বিদায় নিতেন। যে বক্তৃতাটা শুনলাম তাতে কোনো নতুন কথা নেই, জানুয়ারি মাসের পরে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার উল্লেখ নেই। হঠাৎ আমার মনে হল, রাঙাকাকাবাবু ইউরোপ ছেড়ে এশিয়ার পথে পাড়ি দিয়েছেন। আমি সেই রাতেই মাকে ও নীতাকে আমার অনুমানের কথা বললাম। আমি অবশ্য তখন মনে করেছিলাম যে, রাঙাকাকাবাবু খুব সম্ভবত তুরস্ক ও সোভিয়েট সাইবেরিয়ার মধ্য দিয়ে জাপান যাচ্ছেন। তখনও রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে খোলাখুলি কোনো ঝগড়া নেই। সাবমেরিনে এতটা পথ যাত্রার কথা কী করেই বা মনে আসবে?

১৯৪৩-এর ২৬ জানুয়ারি আমাদের স্বাধীনতা-দিবসে রাঙাকাকাবাবু বার্লিনে এক বিরাট অনুষ্ঠানে তাঁর ইউরোপ-প্রবাসের শেষ বক্তৃতা দেন। পুরো অনুষ্ঠানটি বার্লিন রেডিও প্রচার করেছিল, এবং আমরা শুনেছিলাম। মূল বক্তৃতাটি তিনি জার্মান ভাষায় দিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি বয়ানটা আমাদের জন্য প্রচার করেছিলেন। সেই সময়কার ইউরোপের কূটনীতিকরা তো সভায় উপস্থিত ছিলেনই, পশ্চিম-এশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামী কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাও সভায় যোগ দিয়েছিলেন। ঐ সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক' ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বাজানো হয়েছিল, বাজিয়েছিলেন বার্লিনের রেডিও অর্কেস্ট্রা। আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের এত ভাল অর্কেস্ট্রা আমি আর শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

১৯৪৩ সাল যতই এগোতে লাগল, দেশের অবস্থা ততই সঙ্কটাপন্ন হতে লাগল। ইংরেজ সরকার জাপানিদের সঙ্গে যুদ্ধে খুবই বিব্রত, সে-জন্য জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের উপর খড়্গহস্ত। একদিকে যুদ্ধের স্বার্থে চলছে নির্মম জনগণের শোষণ, অন্য দিকে কংগ্রেস নেতা ও হাজার হাজার কর্মী জেলে। জাতীয়তাবাদী বামপন্থীরা—রাঙাকাকাবাবুর অনুগামীদের মধ্যে যাঁরা বাইরে ছিলেন এবং কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির যে-সব নেতা ও কর্মীরা আত্মগোপন করেছিলেন তাঁরা বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম চালাচ্ছিলেন। বাংলাদেশে রাঙাকাকাবাবুর একান্ত বিপ্লবী দল বি ভি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলেই একে-একে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। সরকারি গোয়েন্দাদের তো সর্বক্ষণ ঐ-সব দল ও লোকদের উপর সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বুঝতেই পারতাম আমাদের পিছনে সবসময়েই পুলিশ। এরই মধ্যে এই বাংলাদেশে এক ভয়াবহ কাণ্ড ঘটল। শত্রুর হাতে যাতে কিছু না পড়ে এই অজুহাতে ইংরেজ সরকার বাংলাদেশের মুখের গ্রাসও কেড়ে নিল। আমরা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়লাম। আমাদের কাছে আজও সেই সময়কার কলকাতার পথঘাটের দৃশ্য দুঃস্বপ্নের মতো। বাংলার পল্লীগ্রাম থেকে হাজার-হাজার লক্ষ লক্ষ কঙ্কালসার নারী, পুরুষ ও শিশু কলকাতার রাস্তায় - রাস্তায় এক বাটি ফেনের জন্য আর্তনাদ করে বেড়াচ্ছে। তাদের আকুল ডাক রাত্রের অন্ধকার ভেদ করে ক্রমাগতই কানে আসে, ঘুম হয় না। রাস্তায় কত যে মৃতদেহ দেখেছি তার হিসেব নেই। দেশপ্রেমী, সংগ্রামী সব মানুষ তখন বিদেশী

সরকারের অত্যাচারে কোণঠাসা। সব দেখে ক্ষোভ ও চাপা ক্রোধে মন ভরে যেত, ভাবতাম আরও কত লোক তো দেশে রয়েছে, কেবল লঙ্গরখানা না খুলে তাঁরা আরও তো কিছু করতে পারেন। জগতের গণতন্ত্র রক্ষায় ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এত লোক তো গলাবাজি করছিলেন, ঘরে বসে ঘুষি পাকিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে বিক্রম দেখাচ্ছিলেন, কিন্তু কই,বাংলার অনশনক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ মানুষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে কেউ ডাক দেননি। বিপ্লবের কথা দূরে থাক, সেই সময় এঁরা কেউ ঐ বর্বরোচিত গণহত্যার প্রতিবাদে একদিনের জন্যও ধর্মঘট বা হরতাল ডাকেননি। আমাদের মনে হত বিবেকানন্দ দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রের দেশটা ক্রীতদাসে ভরে গেল কী করে ? যে দিকে চেয়ে দেখি, কেবলই ক্রীতদাস ! অবশ্য তাদের জামার রঙ ভিন্ন ভিন্ন, কারুর সাদা, কারুর সবুজ, কারুর লাল।

সব দুঃখ ও ক্রোধ ছাপিয়ে উঠত একটা আশা—রাঙাকাকাবাবু—আসবেন। তিনি তো বলেই দিয়েছেন আসবেন, খালি হাতে আসবেন না, বিজয়-খড়্গ হাতে নিয়ে আসবেন, রক্তের বন্যা বেয়ে আসবেন। ক্রীতদাসের দেশ আবার বীরের দেশে পরিণত হবে।

পারিবারিক দিক থেকেও ১৯৪৩ সালটা ছিল শোকের বছর। বছরটার মাঝামাঝি ইলার মৃত্যু হল, শেষের দিকে বিদায় নিলেন মা-জননী। আগের বছরের গোড়াতেই একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। জ্যাঠাবাবু সতীশচন্দ্রের বড় ছেলে গণেশ, আমাদের মেজদা, হঠাৎ মারাত্মক রকমের মস্তিষ্কের অসুখে মারা গেলেন। ছোট ছেলে দ্বিজেন তখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী। মেজদার মৃতদেহের পাশে জ্যাঠাবাবু নিশ্চল হয়ে বসে আছেন, সে দৃশ্য দেখা যায় না। কলকাতায় তখন বড়দের মধ্যে বিশেষ কেউ নেই। আমি তখনও পুরোপুরি সুস্থ হইনি। মেজদার শেষকৃত্য করবার জন্য ছোট ভাই দ্বিজেনকে চাই। আমিই দৌড়োদৌড়ি আরম্ভ করলাম। বাবারই হাতে গড়া মন্ত্রিসভা তখন রয়েছে। সন্তোষবাবু কলকাতায় নেই, বাবার মনোনীত অন্য মন্ত্রী-মহাশয় বিশেষ গা করলেন না। ফজলুল হক সাহেবের কাছে গেলাম। তিনি

মা-জননী

পুলিশ সাহেবদের বললেন, বড় ভাইয়ের সৎকার করবার জন্য ছোটভাইকে কয়েক ঘন্টার জন্য ছুটি দেওয়া হোক। তারা তো কিছুতেই রাজি হয় না। বলে, এর দায়িত্ব তারা নিতে পারবে না, ভারত-সরকারকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। ফজলুল হক সাহেবকে দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে টেলিফোন করলাম। তিনি আমাকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে তাঁর ঘরে আসতে বললেন। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আমার সেই প্রথম প্রবেশ। গেটে বলা ছিল, সেজন্য ভিতরে যেতে অসুবিধা হল না। আমাকে সামনে বসিয়ে রেখে শ্যামাপ্রসাদবাবু দিল্লিতে হোম সেক্রেটারি রিচার্ড টটেনহ্যামের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে চাইলেন। কথাবার্তা থেকে বুঝতেই পারছি, সাহেব রাজি হচ্ছে না। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদবাবু ছাড়বার পাত্র নন। শুনে খুব ভাল লাগল যখন শ্যামাপ্রসাদবাবু জোরের সঙ্গে বললেন, এটা করতেই হবে, 'দিস্ হ্যাস টু বি ডান !' শেষ পর্যন্ত টটেনহ্যাম নিমরাজি হল, শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে বললেন। সারাদিন টানাপোড়েনের পরে

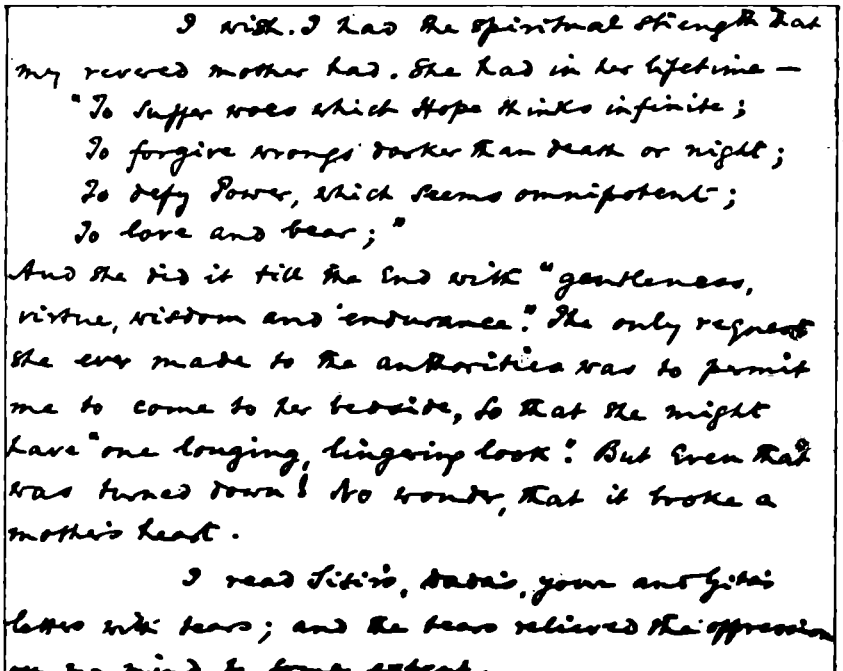

I wish I had the spiritual strength that my revered mother had. She had in her lifetime —
"To suffer woes which Hope thinks infinite;
To forgive wrongs darker than death or night;
To defy Power, which seems omnipotent;
To love and bear;"
And she did it till the end with "gentleness, virtue, wisdom and endurance." The only request she ever made to the authorities was to permit me to come to her bedside, so that she might have "one longing, lingering look." But even that was turned down! No wonder, that it broke a mother's heart.

I read Sisir's, Dada's, yours and Gita's letters with tears; and the tears relieved the oppression on my mind to some extent.

মা-জননীর মৃত্যুর খবর পেয়ে বাবার চিঠি

বিকেলে পুলিশ-পাহারায় জেল থেকে বেরিয়ে এসে দ্বিজেন বড় ভাইয়ের শেষ কাজ করে আবার জেলে ফিরে গেল। শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর রাজনীতির ক্ষেত্রে মূলগত পার্থক্য ছিল, তাঁদের পথ ছিল ভিন্ন, কিন্তু আমাদের পারিবারিক ঐ বিপর্যয়ের সময় তাঁর দৃঢ়তা দেখে আমি বেশ অভিভূত হয়েছিলাম।

আগেই বলেছি সেই সময় আমাদের আশার বাণী আসত বেতারে, রাঙাকাকাবাবুর কণ্ঠে। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আচমকা টোকিও রেডিও ঘোষণা করল যে, সুভাষচন্দ্র বসু জাপানে পৌঁছে গেছেন। খবরটা শুনে আমরা সকলে উল্লসিত হয়ে উঠলাম। সারা রাত রেডিও শুনলাম। টোকিও রেডিওতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ধরে এটাই ছিল প্রধান খবর। রাঙাকাকাবাবুর প্রত্যেকটি কথা ও ভঙ্গি, তাঁর চেহারার বিবরণ, তাঁর সংগ্রামের কাহিনী, এমন-কী তাঁর পোশাকের খুঁটিনাটি, টোকিও রেডিওর প্রোগ্রামে ভরে রইল। দিন দুয়েক পরেই রাঙাকাকাবাবু টোকিও রেডিও থেকে বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি ও জার্মান ভাষায় বক্তৃতা করলেন। সারা পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের ডাক দিলেন আসন্ন চূড়ান্ত সংগ্রামে শামিল হতে। আমাদেরও আশা হল বছরের শেষের দিকে স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হবে। কিছু দিনের মধ্যেই রাঙাকাকাবাবু সিঙ্গাপুরে এসে নামলেন। তারপর থেকে প্রতিদিনই সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, সাইগন, রেঙ্গুন, টোকিও, বাটাভিয়া প্রভৃতি রেডিও মারফত আমরা নতুন-নতুন খবর পেতে লাগলাম। সিঙ্গাপুরে ১৯৪৩-এর ৫ জুলাই আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম বড় প্যারেডে রাঙাকাকাবাবু যে বক্তৃতা দেন সেটা এখনও কানে বাজে। তখন শুনে মনে হয়েছিল, তিনি কত এগিয়ে গেছেন, দেশে আমরা কত পেছিয়ে পড়ে আছি।

ইলার মৃত্যুর খবর রাঙাকাকাবাবু পেয়েছিলেন কি না জানি না। মা-জননীর

মৃত্যুর খবর তাঁর কাছে পৌঁছেছিল জানি, কলকাতা থেকেই এক গোপন-বার্তার মাধ্যমে। দেশে ফেরার পরে দেবনাথ দাস বলেছিলেন, একদিন যথারীতি কাজকর্মের পরে অনেক রাত পর্যন্ত রাঙাকাকাবাবু গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসে ছিলেন। হয়তো এমনিতে কারুকে কিছু বলতেনও না। দেবনাথবাবু বলে ফেলেন, "আজ আপনাকে বড়ই ক্লান্ত দেখাচ্ছে, শুয়ে পড়ুন।"

উত্তরে রাঙাকাকাবাবু বললেন, "না, আমি ক্লান্ত নই, আজ খবর পেয়েছি আমার মা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন।"

১৯৪৩ সালের শেষের দিকে মা-জননীর শরীর ক্রমশই খারাপ হতে থাকে। নতুনকাকাবাবু ডাক্তার সুনীল বসু যখন বুঝলেন যে, তাঁকে বাঁচানো যাবে না তখন শেষ দেখার জন্য বাবাকে নজরবন্দী হিসাবে কলকাতায় আনাবার চেষ্টা শুরু হয়। মা-জননী বাবাকে একবার দেখবার জন্য আকুল হয়েছিলেন। বাঙালি ডাক্তারের কথা বিশ্বাস করবে না বলে সাহেব ডাক্তার ডেনহ্যাম হোয়াইট-এর রিপোর্ট ভারত-সরকারকে পাঠানো হয়। কিন্তু হোম ডিপার্টমেন্ট কিছুতেই বাবাকে কলকাতায় নিয়ে আসতে রাজি হয় না। বাবা জেলে থাকতে আমার মাও একবার ১৯৪৪-এ মরণাপন্ন হয়েছিলেন। বাবার নিজেরই মনে হয়েছিল, মা'র সঙ্গে হয়তো তাঁর আর দেখা হবে না। তখনও কিন্তু ইংরেজ সরকারের মন টলেনি। মা কোনোক্রমে রক্ষা পেয়ে যান, কিন্তু মা-জননীকে আমরা ধরে রাখতে পারিনি। মা-জননীর মৃত্যুর খবর পেয়ে বাবা কয়েকটি মর্মস্পর্শী চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর মা'র কথা তিনি ইংরেজ কবি শেলির ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন—

"জীবনে তাঁকে আশাহীন সীমাহীন দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে ;
মৃত্যু বা নিশার চাইতেও ঘনান্ধকার অন্যায় তিনি ক্ষমা করেছেন ;
যে শক্তিকে মনে হয়েছে দুর্জয়, তা তিনি তুচ্ছ করেছেন ;
ভালবেসেছেন সয়েছেন ;
এবং তা তিনি জীবনান্ত পর্যন্ত করেছেন নম্রতা, ধর্মপরায়ণতা, জ্ঞান ও সহ্যশক্তির সঙ্গে।"

(ক্রমশ)

একটি শব্দের শতবর্ষ

মোহিত রায়

'বয়কট' ইংরেজি শব্দটির অর্থ ও প্রয়োগ আজ আর কারও অজানা নয়। এমন কোনও ইংরেজি অভিধানও পাওয়া যাবে না যেখানে এই শব্দটি নেই। এমনকী রাজশেখর বসু সংকলিত 'চলন্তিকা' বাংলা অভিধানেও 'বয়কট' শব্দটি স্থান পেয়েছে। ইংরেজি অভিধানে শব্দটি 'ভার্ব ট্রানজিটিভ' হিসেবে উল্লিখিত। এদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘটনার সংবাদেও বয়কট শব্দটি বহুল প্রচলিত। এ-বছর এই শব্দটির ব্যবহারের বা প্রয়োগের শতবর্ষ অতিক্রান্ত হল। আজ থেকে একশো বছর আগে ১৮৮১ সালে বয়কট শব্দটি প্রথম প্রচলিত হয় এক নাটকীয় ঘটনায়।

আসলে,বয়কট হল একজন ব্যক্তির পদবি বা উপাধি। সি· সি· বয়কট ছিলেন একজন আইরিশ ক্যাপটেন। আয়ারল্যাণ্ডের মেয়ো অঞ্চলের আর্ন এস্টেট এলাকায় বয়কটসাহেবের প্রচুর জমিজমা ছিল। ১৮৮১ সালে বয়কটসাহেব তাঁর জমিজমার চাষবাসের ব্যাপারে সেখানকার কৃষিশ্রমিক প্রজাদের সঙ্গে প্রচণ্ড বিরোধের সম্মুখীন হলেন। প্রজারা জোট বাঁধল। আইরিশ ল্যাণ্ড লীগ ঘোষণা করলেন যে, বয়কটের কোনো কাজ কেউই করবে না, বয়কটের সঙ্গে কেউ কোনো সম্পর্ক বা যোগাযোগও রাখবে না। এই আহ্বানে অভাবনীয় সাড়া মিলল। সংঘবদ্ধ কৃষিশ্রমিকেরা একজোট হয়ে হাত গুটিয়ে বসে রইল। ফলে, বয়কটসাহেব তাঁর জমিজমা চাষবাসের কাজে কোনো কৃষিশ্রমিক পেলেন না। তাঁকে পুরোপুরি বর্জন করলেন আর্নের কৃষিশ্রমিক ও সাধারণ মানুষ। মানুষের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ফলে বয়কটসাহেব হলেন সমাজচ্যুত, একেবারে একঘরে। এটিই হল প্রথম 'বয়কট'। আর এই ঘটনা থেকেই প্রচলিত হল বয়কট শব্দটি। তারপর থেকেই 'বর্জন' অর্থে বয়কটের নাম ব্যবহৃত হতে থাকে—আজ যা পরিণত হয়েছে একটি আন্তর্জাতিক শব্দে। ইংরেজিতে বয়কট-এর মতো আরও অনেক শব্দ আছে যেগুলি মূলে ছিল ব্যক্তি বা পরিবারের নাম।

Duckback®

স্কুল ব্যাগ

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ লিঃ

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ

naa.BWL 82

রবারের জঙ্গলে বাম্বি

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

শব্দটা সব্বাই শুনেছে। মা, বাম্বি, বুদু, মামমাম, এমন-কী ডোডো পর্যন্ত। কিন্তু শব্দটা কী, তা নিয়ে একটু মতভেদ দেখা যাচ্ছে। মা অবশ্য অর্ধেক সময় অন্যমনস্ক থাকেন। তিনি কতটা মনোযোগ দিয়ে শোনেন, সে-বিষয়ে বাম্বির সন্দেহ আছে। তা না হলে কোনোরকম প্রমাণ ছাড়াই এ-কথাটা কী করে বলেন যে, বাম্বিরই দোষ ?

এটা অবশ্য ঠিক যে, বাম্বির হাঁটু ১৪ বছরের মধ্যে ৪৩ বার ছোট বড় রকমের কেটে গেছে। একটা কানে মেরামতি করতে হয়েছে। ট্রাম থেকে পড়েছে একবার, বাস থেকে দু'বার, আর ছাদ থেকে যে কেন পড়েনি, সেটাই আশ্চর্য !

সুতরাং মা প্রথমটা ভেবেছিলেন, এটা বাম্বিরই কীর্তি। কিন্তু সেদিন যখন বাম্বি খেতে বসেছে, তখন তিন-চারবার ভট্-ভট্-ভটাভট শব্দ হল, আর মা তখন বেশ চোখ গোল-গোল করে বললেন, "এ কী রে বাবা ?" তারপরেই মা বললেন, "তোমার বাবার কাণ্ড দ্যাখো। আমাদের এই জঙ্গলের মধ্যে রেখে তিনি দিব্যি বক্তিমে করতে চলে গেলেন কুইলন ! এখন কী যে হবে কে জানে।"

বাম্বি লক্ষ করে দেখেছে, মা ওর ওপর যতটা রাগ করেন, তার চেয়ে বেশি চোটপাট করেন বাবার ওপর। এখানে একটা কথা বলা দরকার। মা কিন্তু খুবই ভাল। বাম্বি কী কী ভালবাসে সমস্ত মা'র নখদর্পণে। যখন খুব রেগে থাকেন মা (দাদা বলে মা রেগেই থাকেন, খুব রেগে থাকেন আর ভীষণ রেগে থাকেন) তখনও মাংসের রোস্ট হলে বাম্বির জন্য বড় ভাগটা কেটে রাখেন। আসলে রোস্ট-মাংস মা'র মতন কেউ রাঁধতে পারে না। তা ছাড়া মা কত খাবার করতে জানেন। এরকমটি আর কোথাও পায় না বাম্বি। মাঝে-মাঝে বাম্বি ভাবে পৃথিবীতে কোনো জিনিস পুরো পাওয়া যায় না। আমের সঙ্গে আঁটি থাকে, স্কুলের সঙ্গে হোমটাস্ক-আর পরীক্ষা থাকে, আর মা'র সঙ্গে মা'র মেজাজ থাকে।

বুদু, মানে বাম্বির দাদা, খুব তালেবর ছেলে। যাদবপুর ইউনিভারসিটিতে পড়ে। বাম্বির মনে হয়, আহা, ও কবে অমনভাবে 'পড়াশোনা' করতে পারবে। একখানা খাতা নিয়ে ইউনিভারসিটি যায়। ভগবান জানেন কী পড়াশোনা করে। দাদার বই এই নিয়ে দু'চারবার নেড়েচেড়ে দেখে ওর মনে হয়েছে খুব সহজ ব্যাপার।

যা হোক, কথা হচ্ছিল শব্দ নিয়ে। বুদু সেই শব্দ শুনে বলেছে, কেউ রবার কাটছে বোধহয়। মোটের ওপর ব্যাপারটার উপরে খুব গুরুত্ব দেয়নি দাদা।

মামমাম একটু ঘাবড়ে আছে। কারণটা

বলছি, তার আগে মামমাম সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলে নিই। মামমাম কারুর নাম হয় না। কিন্তু তোমরা যদি একটু ভেবে দ্যাখো, তাহলে বুঝতে পারবে এ-সব নামের প্রয়োজন কী। বাম্বিদের স্কুলে তেত্রিশজন দেবাশিস আছে। তাই ওরা কাউকে গোলআলু বলে, কাউকে ময়দা বলে, কাউকে বোলতা বলে। মামমাম কারুর মাসি, কারুর পিসি, কারুর কাকি। ওরা তাই সহজ করে ওর নাম দিয়ে নিয়েছে মামমাম। মা'রও একটা গোপন নাম আছে। তোমরা কাউকে বলে দেবে না জানি বলেই তোমাদের বলছি নামটি। ছেলেমেয়েরা মা'কে হেডমাস্টার বলে। মামমাম ভীষণ ভাল, সুন্দর দেখতে, মিষ্টি করে কথা বলে, আর পৃথিবীতে কেউ যে কোনো খারাপ কাজ করতে পারে, কেউ যে অতি দুষ্ট প্রকৃতির লোক হতে পারে, মামমাম এটা বিশ্বাসই করে না। মামমাম যখন ছোট ছিল, মামমামের মা বকুনি দিলে মামমাম বলত, 'তুমি মিছিমিছি বকেছ, তাই না মা ?' মানে মা'র বকাটা কখনো সত্যি হতে পারে না।

এই মামমামকে একবার ডাকাত ধরেছিল। মানে একলা মামমামকে নয়, পুরো দলকে। মা ছিলেন, বাবা ছিলেন, বাম্বিও ছিল, আর ছিল মেসো। ডাকাতরা ঘিরে ধরল। বাম্বি দেখেই বুঝেছে, ডাকাত। পাইপগান ঠেকিয়ে বলছে, "কী আছে দাও। নইলে ”। বাবা চুপ, মেসো চুপ। বুদু কী একটা বই পড়ছিল, তাই নিয়ে মত্ত রইল। শুধু মামমাম নির্বিকার। মামমামের ধারণা হয়েছিল, এরা পুজোর চাঁদা চাইতে এসেছে। সুতরাং মামমাম বলতে লাগল, "আপনারা চাঁদা নেবেন বলে রাস্তায় গাড়ি ধরবেন ? তাও আবার হাতে লোহার ডাণ্ডা ?" মামমামের ধারণা, ওই পাইপগানগুলো লোহার ডাণ্ডা। মামমাম তখন বলেই চলেছে, "চাঁদা চাইবেন ভদ্রভাবে চান। অসভ্যতা করবেন কেন ? জানেন কলকাতায় এখন চাঁদা নিয়ে জুলুম করলে ফাইন হয় ?"

ডাকাতরা তার কথার তোড়ের মুখে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা। ততক্ষণে মামমাম হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে তার বটুয়ার মধ্যে। অনেক খুঁজেপেতে একটা আধুলি পেয়েছে। সেটাকে বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মধ্যে ধরে তুলে ধরেছে, তারপর একগাল মিষ্টি হেসে প্রশ্ন করেছে,"এতে হবে ?"

ডাকাতদলের অবস্থা তখন সঙ্গিন। এত বড় অপমান তাদের জীবনে হয়নি। কেউ বলতে পারে আধুলিতে হবে কি না, এটা তাদের জানাই ছিল না।

বুদুর দৃঢ় বিশ্বাস এই দলের মধ্যেই সেই ডাকাত ছিল, যে পরে গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে ম্যাজিক দেখাত। বুদুর মতে তার দস্যুজীবনের ওপর একেবারে ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছিল মামমাম। দস্যুদের ভ্যাবাচ্যাকা খেতে দেখে সুযোগ বুঝে মেসো বুদ্ধি করে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিল। পেট্রোল না ফুরনো পর্যন্ত সে গাড়ি থামেনি। বাবা আর মেসো যখন রাস্তায় নেমে গাড়ির বুটলেগে-রাখা পেট্রোলের টিন থেকে পেট্রোল ভরছে, তখন মামমাম বলল, "তোমরা অমন করে পালিয়ে এলে কেন ? ওদের আমি অভদ্র বলেছি, কিন্তু তোমরাই বা কী ভদ্রতার পরিচয় দিলে ?"

তখন বাম্বি মামমামকে বুঝিয়ে বলল যে, ওরা চাঁদা চাইছিল না, সব লুটপাট করে নিতে চাইছিল। মামমাম একগাল হেসে বলল, "কী যে বলিস ! ডাকাত হবে তো কানে জবাফুল নেই কেন ?" তারপর সবাই যখন বুঝিয়ে বলল, তখন মামমাম খুব কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "ওরা কি আমার এই বালাটাও নিয়ে নিত রে ? এটা যে আমার দিদিশাশুড়ির দেওয়া।"

মেসো বললেন, "না, ওরা যখন শুনত যে,

প্রজাপতি-ধাঁধার সমাধান

ওটা দিদিশাশুড়ির দেওয়া, তখন বোধহয় নিত না।"

সেই থেকে মামমাম একটু ভয়ে-ভয়ে থাকে, কখন ডাকাতরা ফিরে আসে। এই ভট্‌ভট্‌ শব্দ শুনে স্থিরনিশ্চিন্ত যে, ডাকাতরা ঘিরে ধরছে, সেদিনের শোধ নেবে। মুখ শুকিয়ে ঘুরছে।

অথচ কুইলনে এসেছিল ওরা ছুটি কাটাতে। বাম্বির বাবা কুইলনে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। বাম্বির বাবা খুব ভাল বক্তৃতা দেন। বাম্বির মা বলেন, উনি নাকি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বক্তৃতা দেন। বাম্বি অবিশ্যি বাবাকে কক্ষনো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বক্তৃতা দিতে শোনেনি। বাবা প্রচণ্ড পণ্ডিত লোক, সুতরাং তাঁর নিজের বিষয়ে তিনি প্রচণ্ড জানেন বলে লোকেরা বলে। কিন্তু কোন্ বিষয়ে জানেন না, সেটা বাম্বি বুঝতে পারে না। ধরো কথা উঠল ইলিশমাছ নিয়ে। সামান্য কথা। কিন্তু সেটার ওপর বাবা ঝাড়া দু' ঘণ্টা বক্তৃতা দেবেন। প্রথমত, ময়মনসিংহে ইলিশ পাওয়া যায় না। বাবাদের বাড়ি ছিল ময়মনসিংহে। সুতরাং বাবা যে-কোনো বিষয় শুরু করেন ময়মনসিংহের উদাহরণ দিয়ে। বাম্বির ধারণা, তাজমহল নিয়ে আলোচনা হলেও উনি এইভাবে শুরু করবেন যে, ময়মনসিংহে তাজমহল গঠিত হয়নি। যাক গে, ইলিশ মাছে ফিরি। ময়মনসিংহ সেরেই উনি পদ্মার ইলিশ আর গঙ্গার ইলিশের পার্থক্য বোঝাবেন। তারপর গঙ্গা আর রূপনারায়ণের ইলিশ কোথায় আলাদা সেটা বোঝাবেন। তারপর পড়বেন কী-রকমভাবে ইলিশ চিনতে হয় তাই নিয়ে। সেখানেও বিস্তারিতভাবে বোঝাবেন কীভাবে পরীক্ষা করতে হয় ডিম আছে কি না। (বাম্বি ইলিশ মাছের চেয়ে তার ডিম বেশি ভালবাসে। এত পরীক্ষার প্রয়োজন বোঝে না)। এ সম্বন্ধে বাবার বন্ধুরা যে নেহাতই অজ্ঞ সে-কথাও একবার বলে দেবেন। তারপর রান্নায় চলে আসবেন। ইলিশমাছের কোন্ জায়গাটা ভেজে খেতে হয়, কোন্‌টা পুঁইশাক আর কুমড়ো দিয়ে বেশি উপাদেয়, পাতুরি আর ভাপে সেদ্ধর জন্য সর্ষে কীভাবে বাটতে হয়, এ-সব নিয়ে আরও কিছুক্ষণ চলবে। তা ছাড়া যখন পদ্মার সম্বন্ধে বলবেন, তখন পদ্মা নদীর ইতিহাস আর ভূগোল বিষয়ে কোনও তথ্যই বাকি থাকবে না।

আবার অন্য কথায় এসে গেলাম। বাবা এসেছেন কুইলনে সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সরকারকে পরামর্শ দিতে। বাবা আসতে চাননি। তবু যখন সরকার জেদ করেছেন, তখন বলেছেন, যাব, তবে আমাকে কোনো একটা রবার-খামারে থাকার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে, তবেই আমি যাব।

কয়েকটা দিন ছুটি থাকায় মামমাম এসেছে, বুদু বাম্বিও এসেছে। মা'ও এসেছেন। এখানে এসে মালয়ালম না-জানার দরুন মা'র রান্না বোঝাতে অসুবিধা হচ্ছে বলে মা নিজেই রান্না করে নিচ্ছেন। এতে বাম্বির আপত্তি নেই, কিন্তু মা আরও হেডমাস্টারি মেজাজে চলেছেন। বাবা ওদের এখানে রেখে কুইলন গেছেন সেমিনার করতে। ফিরবেন কাল। তবে যেটুকু সময় পেয়েছেন, তাইতেই খুব প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে গেছেন রবার-সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য। বাম্বিরা শুনেছে কেমন করে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পরে রবারের কথা জানা গেছে। কিন্তু যতদিন না হঠাৎ ভুল করে রবারের সঙ্গে গন্ধক মিশে যায়, ততদিন জানা যায়নি যে, রবারকে নমনীয় অথচ শক্ত কী করে করা যায়। তখনই গুডইয়ার হেওয়ার্ড হ্যানকক নামের সাহেবরা এর চাষে উদ্যোগী হয়। কিন্তু মজা এমনি যে, বিষুবরেখার ১০° উত্তর থেকে ১০° দক্ষিণের বাইরে এ-গাছ জন্মায় না। এর জন্য চাই ৭০ থেকে ৯৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রা, ৮০ থেকে ১২০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত। একটু উঁচু জায়গা চাই, কিন্তু হাজার ফুটের ওপর হলে চলবে না। এদের চারাকে খুব সাবধানে রাখতে হয়, তারপর একর-প্রতি দেড়শো চারা পুঁততে হয়। রবারগাছকে ১৩০ ফুট অবধি উঁচু হতে দেখা গেছে, কিন্তু সাধারণত পাঁচ বছরে এরা ৬০ ফুট অবধি লম্বা হয়, আর গাছের ঘের হয় সাত ফুট। একটা গাছ ৩০/৪০ বছর অবধি রবার দেয়। রবার সংগ্রহ করার কায়দাটা আমাদের খেজুর রস সংগ্রহ করারই মতন। বাংলার গ্রামে-গ্রামে যেমন খেজুরগাছে হাঁড়ি বাঁধা থাকে রবারগাছেও তেমনি বড় বড় পাত্রে রবার গাছের রস সংগ্রহ করা হয়।

বাবা যদি একবার শুরু করেন, তখন তাঁর অবস্থা—সুকুমার রায়ের ভাষায়—ছুটলে কথা থামায় কে? এরপর কত রকমের রবারগাছ আছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা

রবীন্দ্রকন্যা
মাধুরীলতার
গল্প আর চিঠি

মাধুরীলতা রবীন্দ্রনাথের মেয়ে, এটা একটা পরিচয়। আরেকটি বড়ো পরিচয়, মাধুরীলতা খুব সুন্দর সব গল্প লিখেছেন। 'ওর ক্ষমতা ছিল'—মেয়ের গল্প-লেখা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিকে সম্পূর্ণ যথার্থ মনে হয়, "মাধুরীলতার গল্প" বইটি পড়লে। কী সুন্দর ভাষা, কী সুন্দর বিষয়। আরেকটি সুন্দর বই 'মাধুরীলতার চিঠি'। যেন আরেক রবীন্দ্রনাথকে পাই আমরা, যে-রবীন্দ্রনাথ সংসারী, কন্যার আবদার রাখেন, মেয়েকে উপদেশ দেন বিবাহ পরবর্তী জীবনের জন্য। দুটি বই-ই সম্পাদনা করেছেন পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

মাধুরীলতার দুটি বই
পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়
সংকলিত

মাধুরীলতার চিঠি ৫·০০
মাধুরীলতার গল্প ৬·০০

আরো অনেক বই

কুম্ভক-এর শব্দ নিয়ে খেলা ১০·০০ সংকর্ষণ রায়ের গভীর গহন ৭·০০ ননীগোপাল চক্রবর্তীর চরকাবুড়ি ৬·০০ যাদুঘরে চলো যাই ৬·০০ পীর ফকিরের আস্তানায় ৬·০০ গিরিধারী কুণ্ডুর টংসা চু ৬·০০ রাত একটা ৪·০০ সুবোধ ঘোষের সেই অদ্ভুত অভ্রখনি ৬·০০ বিমল মিত্রের কে ? ১৫·০০ রাজা হওয়ার ঝকমারি ৮·০০ দাশরথির বাহাদুরি ৮·০০ শিশিরকুমার মজুমদারের তুফান দরিয়ার পরান মাঝি ৭·০০ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাওয়াবদল ও অন্যান্য রচনা ৮·০০ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটনো ৬·০০ সন্তোষকুমার ঘোষের দুপুরের দিকে ৮·০০ অন্নদাশংকর রায়ের রায়ের হৈ রে বাবুই হৈ ৬·০০ মঞ্জিল সেনের ডাকাবুকো ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

করেছেন বাবা। তবে যে-নামটা ওর মনে থেকেছে সেটা হল হিঙিয়া। এই গাছটিই নাকি সবচেয়ে ভাল। মামমাম অবাক হয়ে শুনেছে। মা নাক সিঁটকে শুনেছেন। বুদু খানিকটা বেজার হয়ে শুনেছে। আর বাম্বি মনে করেছে, আহা, মাস্টারমশাইরা কেন বাবার মতো মজা করে পড়ান না।

শব্দটা রাত্রে হয়েছিল। দিনের বেলা বাম্বি রবারের জঙ্গলে ঘুরে-ঘুরে বেড়িয়েছে। দেখেছে, দিনের বেলাতেও শব্দটা শোনা যায়। ভট্‌ভট্‌। কখনো কাছে, কখনো দূরে। বাম্বি ভূত-টুতে ভয় পায় না, কিন্তু ওরও কেমন গা ছমছম করে উঠেছে। কোথাও হদিস পায়নি।

হদিস পাওয়া গেল সন্ধ্যাবেলা। বাবা ফিরলেন। বাবাকে দেখে বাম্বির একটু ভরসা এল। বাবা ঠিক একটা সুরাহা করবেন। মামমাম বলল, ডাকাত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। বুদু বলল, ওর ধারণা জঙ্গলে কেউ লুকিয়ে জন্তু-জানোয়ার মারতে আসে। বাম্বি বলল, ও দিনের বেলায় খুব কাছ থেকে শব্দটা শুনেছে, ওর মনে হয়েছে কালীপুজোর বাজি ফোটানোর শব্দ। মা কিছু বলেননি। শুধু বলেছেন, "স্ত্রীপুত্রকে জঙ্গলে ফেলে বক্তৃতা দিতে যাওয়ার নাম করে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না।"

বাবা তো মায়ের কথা শুনে একদম চুপ।

এই সময় একসঙ্গে আবার শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। সবাই বলে উঠল, ওই! ওই! ওই!

শব্দটা শুনে বাবা খানিকক্ষণ নানা ভঙ্গি করে হেসেছেন। শেষে হাসি থামিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন মামমামকে, "এই শব্দ শুনে তোমার দস্যুদের কথা মনে হয়েছে?" বলে আবার বেদম হাসি। তারপর হাসি থামিয়ে বলেছেন, তোমাদের বলতে ভুলে গেছি, রবারের ফল ওই রকম শব্দ করে ফাটে। ওইভাবে ফাটার ফলে বীজটা চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। এটা প্রকৃতিই করে রেখেছেন, তিনি গুডইয়ার সাহেবের ভরসায় ছিলেন না। আর এই শব্দ শুনে তোমরা ভয় পেয়েছ!"

তারপর বাম্বিকে বলেছেন, "আমাজনের নদীর ধারের লোকেরা এগুলো খায়, তুই জানিস

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ছবির মজা

ফুটকি-দেওয়া খোপগুলি রঙিন পেনসিল বুলিয়ে ভরাট করো। তারপর অন্য-রঙের পেনসিল বুলিয়ে ভরাট করো ফুটকি-না-দেওয়া খোপগুলিকে। তারপর দ্যাখো, ব্যাপারটা কী দাঁড়াল।

এও শব্দ-সন্ধানের খেলা, তবে ইংরেজিতে। সূত্র আর ছবি দেখে ঘর ভরাট করো।

আঃ মেলা ১৬-৬-৮২-ফঃ৪

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়'স **সদাশিব** দৌড়োদৌড়ি কাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ

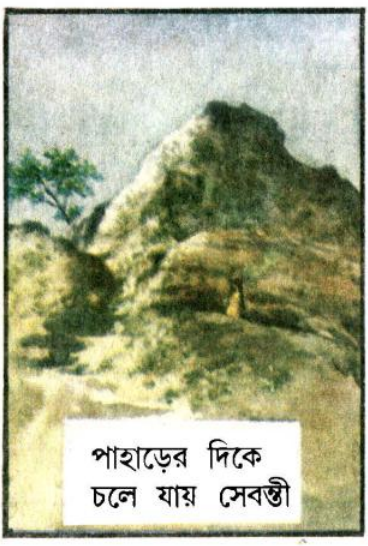

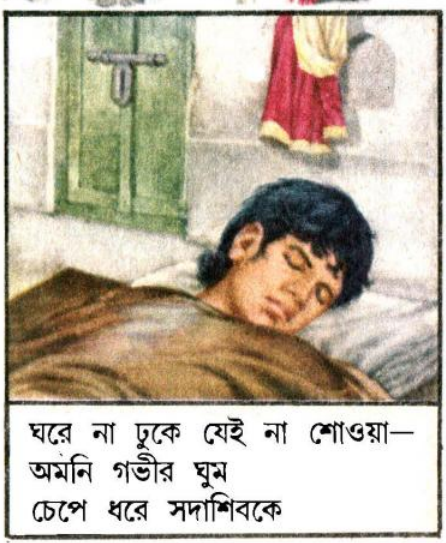

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখে
তার সেই প্রিয় ডোঙরপুর
গ্রাম আর কুঙ্কুকে

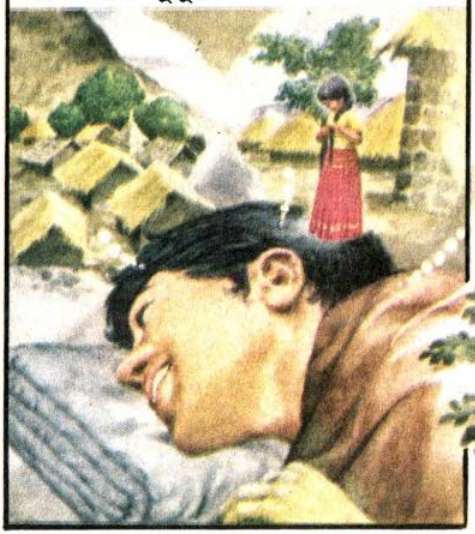

কুঙ্কু এখন কত
বড় হল ?
এখনও কি সে
মাঝে-মাঝে সদাশিবের
কথা ভাবে ?

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
ম্যানেজারের ভূমিকায় বেন গ্যালোয়ে বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারছে না !
জিওফ, তুমি হেড করতে এলে কেন ?
আমারই তো হেড করার কথা
ভার্ননকে 'ডামি' বানিয়ে আমিই সাধারণত হেড করে থাকি !
কী হচ্ছে জিওফ ?
রয়, আমার একটু কাজ আছে, আজকের মতো তুমিই বরং কোচিং চালাও !
ঠিক আছে...
বেনকে চটানো ঠিক হল না !
আসলে তোমার কোচিংয়ে আমরা তো অন্যভাবে খেলি !
পরের ম্যাচ কারফোর্ড সিটির সঙ্গে। লিগ টেবিলে তারাই এখন শীর্ষে...
ওরা কীভাবে খেলে, বেন তা জানে তো ?
কারফোর্ডে পৌঁছে...
আজ রাত্তিরে এখানকার একটা মাঠে তোমাদের প্র্যাকটিস করাব।
রাত্তিরে !
প্র্যাকটিসের মাঠে...
এবড়ো-খেবড়ো মাঠ ! প্র্যাকটিস জমবে না !
ফ্লাডলাইটেই বা খেলব কেন ?

চার্লি, আগে তোমাকেই প্র্যাকটিস দেব। আটকাও!
বেশ তো!
কিন্তু...
যাঃ!
চার্লির টাইমিং ঠিক হয়নি!
ধুত! ফ্লাডলাইট ঠিকভাবে বসানো হয়নি!
তা আর কী করা যাবে!
টুপি পরে, চোখ বাঁচিয়ে, বল আটকাল চার্লি...
বাঁচিয়েছে!
নাঃ, এই আলোয় চার্লির পক্ষে স্বাভাবিকভাবে বল ধরা সম্ভব নয়।
একটু বাদে...
বাঃ, ক্রমেই চার্লির উন্নতি হচ্ছে!
বেন, তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু...
এমন মাঠ বাছলাম কেন, এই তো? কাল যখন রোদ্দুর ঝলসাবে, তখন বুঝবে।
মাঠে নামবার সময় বেনের কথা মনে পড়ল রয়ের...
রোভার্স
কারফোর্ড!
উঃ, কী রোদ্দুর!
এই চোখ-ঝলসানো রোদ্দুরেই খেলতে হবে!
টসে রোভার্স হারল...
রিচি, তুমি কিক-অফ নেবে নিশ্চয়?
মোটেই না, রয়...
আমি ওই দিকে খেলব!
সাইড পালটাবার তাৎপর্য কী?
কার্টার, কালো চশমা এনেছ তো?
চশমারই বা কী তাৎপর্য?
বেনের কাছে উত্তর পাবার আশা নেই!
কেন সাইড পালটানো? কেন চশমা?
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

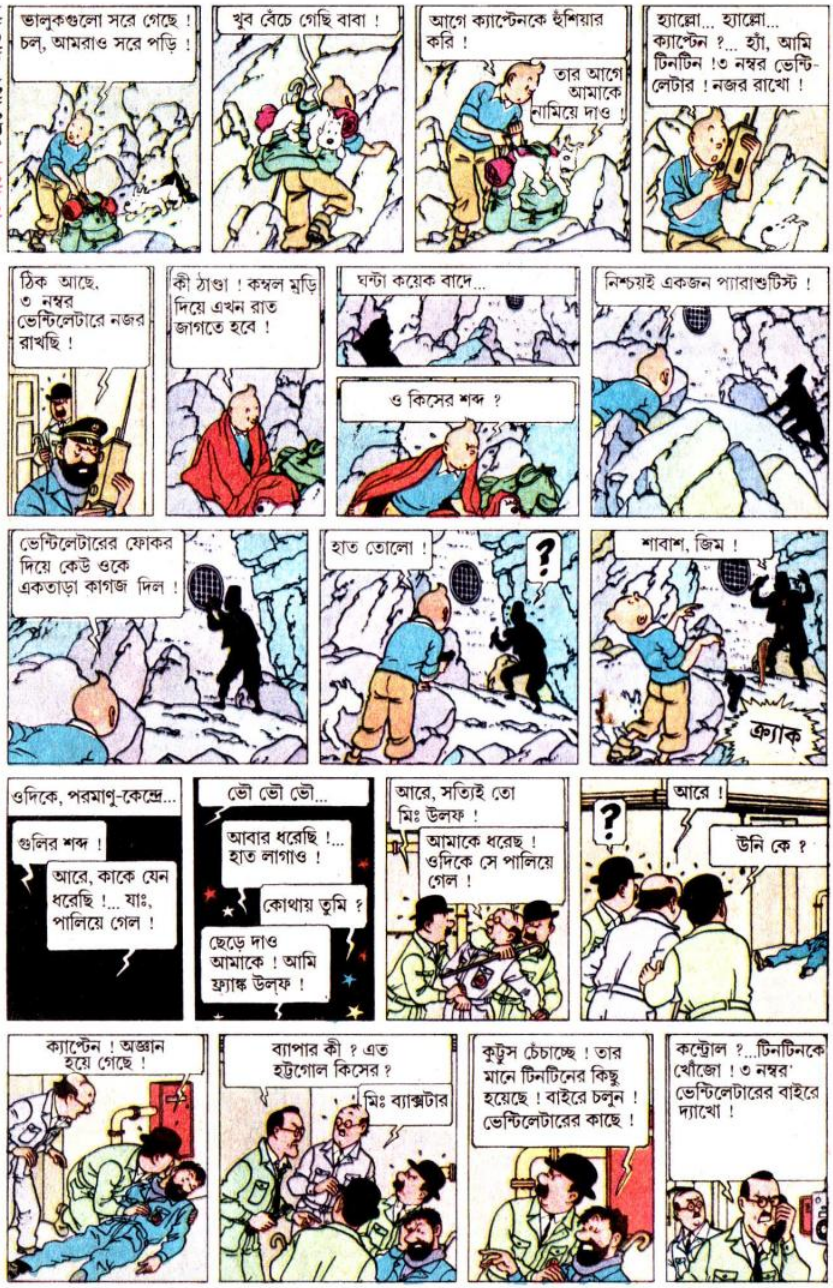
ভালুকগুলো সরে গেছে ! চল্, আমরাও সরে পড়ি !
খুব বেঁচে গেছি বাবা !
আগে ক্যাপ্টেনকে হুঁশিয়ার করি !
তার আগে আমাকে নামিয়ে দাও !
হ্যাল্লো... হ্যাল্লো... ক্যাপ্টেন ?... হ্যাঁ, আমি টিনটিন ! ৩ নম্বর ভেন্টিলেটার ! নজর রাখো !
ঠিক আছে, ৩ নম্বর ভেন্টিলেটারে নজর রাখছি !
কী ঠাণ্ডা ! কম্বল মুড়ি দিয়ে এখন রাত জাগতে হবে !
ঘন্টা কয়েক বাদে...
ও কিসের শব্দ ?
নিশ্চয়ই একজন প্যারাশুটিস্ট !
ভেন্টিলেটারের ফোকর দিয়ে কেউ ওকে একতাড়া কাগজ দিল !
হাত তোলো !
?
শাবাশ, জিম !
ক্র্যাক
ওদিকে, পরমাণু-কেন্দ্রে...
গুলির শব্দ !
আরে, কাকে যেন ধরেছি !... যাঃ, পালিয়ে গেল !
ভৌ ভৌ ভৌ...
আবার ধরেছি !... হাত লাগাও !
কোথায় তুমি ?
ছেড়ে দাও আমাকে ! আমি ফ্র্যাঙ্ক উল্ফ !
আরে, সত্যিই তো মিঃ উলফ !
আমাকে ধরেছ ! ওদিকে সে পালিয়ে গেল !
?
আরে !
উনি কে ?
ক্যাপ্টেন ! অজ্ঞান হয়ে গেছে !
ব্যাপার কী ? এত হট্টগোল কিসের ?
মিঃ ব্যাক্সটার
কুটুস চেঁচাচ্ছে ! তার মানে টিনটিনের কিছু হয়েছে ! বাইরে চলুন ! ভেন্টিলেটারের কাছে !
কন্ট্রোল ?...টিনটিনকে খোঁজো ! ৩ নম্বর ভেন্টিলেটারের বাইরে দ্যাখো !

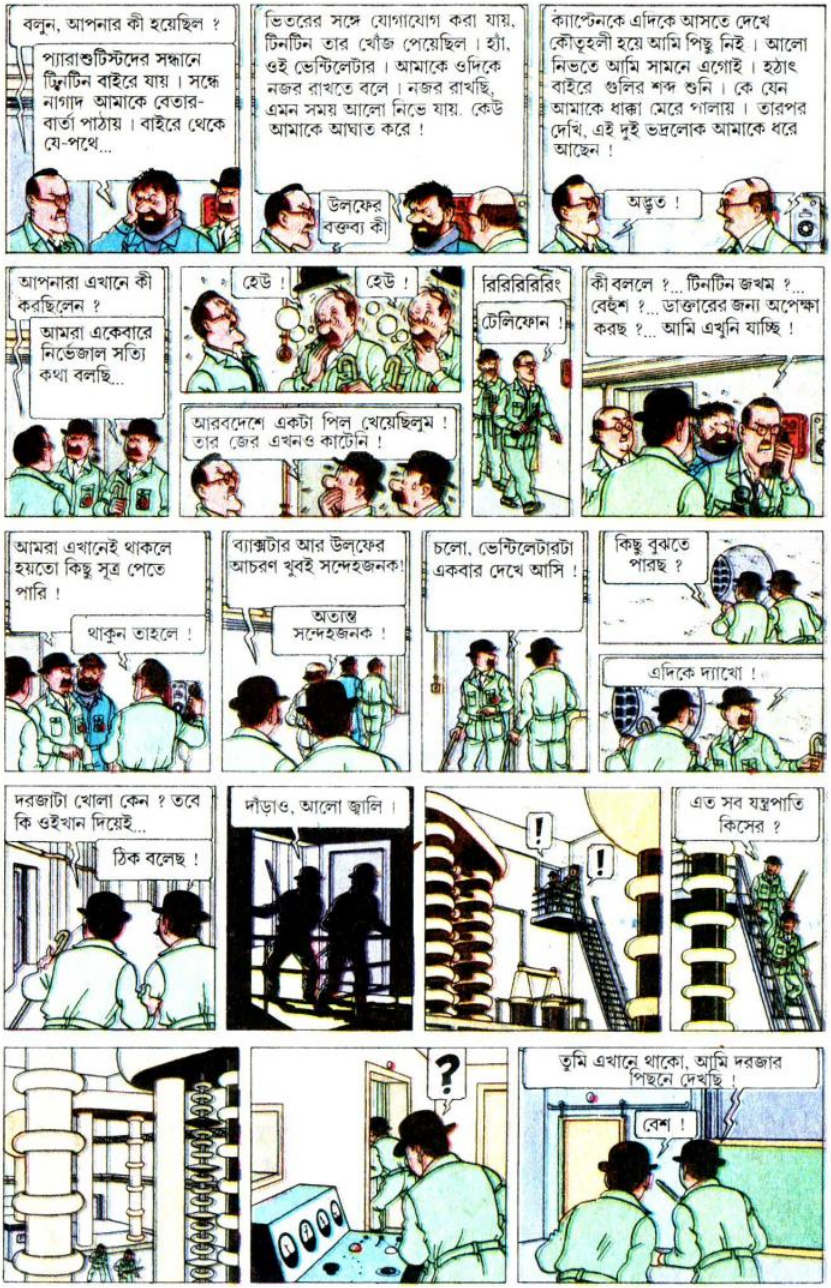
বলুন, আপনার কী হয়েছিল ?
প্যারাশুটিস্টদের সন্ধানে টিনটিন বাইরে যায়। সঙ্কে নাগাদ আমাকে বেতার-বার্তা পাঠায়। বাইরে থেকে যে-পথে...
ভিতরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়, টিনটিন তার খোঁজ পেয়েছিল। হ্যাঁ, ওই ভেন্টিলেটার। আমাকে ওদিকে নজর রাখতে বলে। নজর রাখছি, এমন সময় আলো নিভে যায়. কেউ আমাকে আঘাত করে !
উলফের বক্তব্য কী
ক্যাপ্টেনকে এদিকে আসতে দেখে কৌতূহলী হয়ে আমি পিছু নিই। আলো নিভতে আমি সামনে এগোই। হঠাৎ বাইরে গুলির শব্দ শুনি। কে যেন আমাকে ধাক্কা মেরে পালায়। তারপর দেখি, এই দুই ভদ্রলোক আমাকে ধরে আছেন !
অদ্ভুত !
আপনারা এখানে কী করছিলেন ?
আমরা একেবারে নির্ভেজাল সত্যি কথা বলছি...
হেউ !
হেউ !
আরবদেশে একটা পিল খেয়েছিলুম ! তার জের এখনও কাটেনি !
রিরিরিরিরিং
টেলিফোন !
কী বললে ?... টিনটিন জখম ?... বেহুঁশ ?... ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করছ ?... আমি এখুনি যাচ্ছি !
আমরা এখানেই থাকলে হয়তো কিছু সূত্র পেতে পারি !
থাকুন তাহলে !
ব্যাঙ্কটার আর উলফের আচরণ খুবই সন্দেহজনক!
অত্যন্ত সন্দেহজনক !
চলো, ভেন্টিলেটারটা একবার দেখে আসি !
কিছু বুঝতে পারছ ?
এদিকে দ্যাখো !
দরজাটা খোলা কেন ? তবে কি ওইখান দিয়েই...
ঠিক বলেছ !
দাঁড়াও, আলো জ্বালি।
!
!
এত সব যন্ত্রপাতি কিসের ?
?
তুমি এখানে থাকো, আমি দরজার পিছনে দেখছি !
বেশ !

(এর আগামী সংখ্যায়)

শব্দ-সন্ধান

১	২	৩		৪	৭	৯
	৬					
৭				৮		
১		১০		১১		১২
		১৩				
১৪				১৫		

সংকেত পাশাপাশি (১) কোন্ গান ফলফুলের জন্যে ? (৪) যে বহন করে। (৬) কোন্ দেশ উপমহাদেশ ? (৭) ঔষধিগুণযুক্ত গাছ। (৮) সৌন্দর্য। (৯) পক্ষিবিশেষ। (১১) মনের কোন্ অবস্থাটা নড়ে ? (১৩) পাখি। (১৪) সুর করে পড়ার বিষয়। (১৫) কুঁচ।

উপর-নীচ (২) বিখ্যাত খেলোয়াড়। (৩) স্বর্গের বিপরীত। (৪) কোন্ গাছ থেকে গঁদ হয় ? (৫) একজন দানশীল সম্রাট। (৯) কোনো কাজে সিদ্ধিলাভ করতে গেলে কী চাই ? (১০) সূর্য। (১১) রবীন্দ্রনাথের 'শরৎ' কবিতায় এই ফুলের উল্লেখ আছে। (১২) বিখ্যাত শহর - নামের তিন-চতুর্থাংশ নিলে কোন্ নকশা পাওয়া যায় ?

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

বা	ম	ন		কা	স	র
	ল্লা		দা		ফ	
ফা	র		দা		রী	তি
নু		কা	ঠা	ল		তা
স	খা		কু		হা	স
	জ		র		সু	
পা	না	জি		গা	লি	চা

ধাঁধা

—ছোট্কার অফিসের জরুরি কাজ চলছে। অফিস থেকে ফিরেও ছোট্কার ছুটি নেই। নিজের ঘরে বসেই কদিন ধরে নাগাড়ে কাজ করে চলেছে ছোট্কা।

কিন্তু আমার তো দেরি করলে চলবে না। ধাঁধা চাই। আজ-নেব-কাল-নেব করে সময় পেরিয়ে গিয়েছে। অগত্যা সেদিন রাত নটার সময় ছোট্কার ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

টাইপরাইটার মেশিনে খাম চাপিয়ে ছোট্কা খুটখুট করে টাইপ করে যাচ্ছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে হাঁক দিল, "এদিকে আয় তো একবার।"

আমি ঘরে ঢুকলাম। ছোট্কা ইশারায় পাশের টুলটায় বসতে বলল। বসলাম। মেশিনে নতুন খাম চাপাতে-চাপাতে ছোট্কা আমাকে

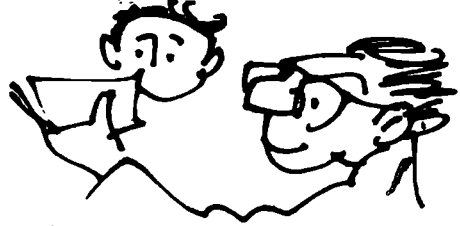

বলল, "নাম ঠিকানা দেখে-দেখে এই চিঠিগুলো ঠিক-ঠিক খামের মধ্যে ভরে দিতে পারবি ?"

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। ছোট্কা তখন টেবিল থেকে খান-আষ্টেক খাম আর দশটা চিঠি আমার হাতে তুলে দিল। খামের ওপরের ঠিকানা আর নামের সঙ্গে চিঠির নাম আর ঠিকানা মেলানো। আমি খামে চিঠি ভরতে লাগলাম।

এর মধ্যেই ছোট্কার বাকি দুটো খামে নাম-ঠিকানা টাইপ করা হয়ে গেছে। ছোট্কা নিজের হাতের সে-দুটো খামে চিঠিগুলো ভরে ফেলল। তারপর আমার ভরা খামগুলো নিয়ে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল, ঠিক-ঠিক খামে চিঠিগুলো ভরেছি কি না।

দশটা খামই দেখা হয়ে গেছে, ছোট্কা একটা বড় প্যাকেটে সেগুলো ঢুকিয়ে রাখছে, ঠিক এমন সময় আলো চলে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমে এল সারা পাড়া জুড়ে।

ছোট্কা বলল, "বাঁচা গেল। কাজটা তো শেষ। অন্ধকারকে এখন আর অত ভয় পাবার কিছু নেই।"

একটু পরেই ছোট্কার গলা আবার শোনা গেল, "এই যাঃ, মোমবাতি যে নেই।" তারপর বলল, "সতুবাবু, একটা ধাঁধার উত্তর দাও তো। তারপর নীচে যাওয়া যাবে।"

ছোট্কা যে-ধাঁধাটা বলল সেটা দিয়েই এবার শুরু করছি।

প্রথম ধাঁধা ॥ দশটা খামে দশটা চিঠি ভরা হবে। চিঠিতে নাম-ঠিকানা রয়েছে, রয়েছে খামেও। ঠিক খামে ঠিক চিঠি ভরতে হবে। কিন্তু ঘরে এক ফোঁটাও আলো নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকারেই কপাল ঠুকে সম্পূর্ণ আন্দাজে, ধরা যাক, খামে চিঠিগুলো ভরে ফেলা হচ্ছে। আশা যে, ঠিক খামেই ঠিক চিঠি ভরা হবে। এই অবস্থায়, অন্তত একটা চিঠি ভুল খামে ভরা হবে, এর সম্ভাবনা কতটা ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ আগে-পরে উপযুক্ত অক্ষর বসাও যাতে অর্থযুক্ত শব্দ হয়—

—তিশীতো—

গতবারের উত্তর ॥ (১) প্রথম ১,৮, ১১ ও ১৪। দ্বিতীয় ২, ৫, ১২ ও ১৫। তৃতীয় ৩, ৬, ৯ ও ১৩। চতুর্থ ৪, ৭, ১০ ও ১৩। মোট ৩৪ লিঃ করে প্রত্যেকে। (২) মিটমিট। (৩) জয়ের ইচ্ছা।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

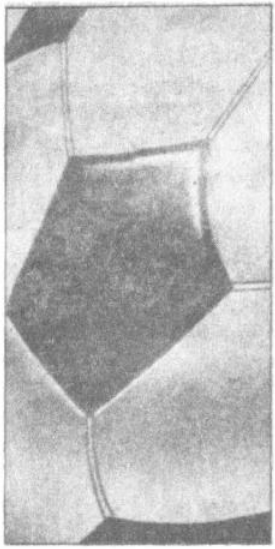

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল
দাবার বোর্ডের ফোটো
ফোটো তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ তোমার হাতটা মচকাল কী করে ?

উঃ নিজের পিঠ নিজে চাপড়াতে গিয়ে।

প্রঃ সব সময়েই কটু কথা বলো কেন, একটু নরম করে বলতে পারো না ?

উঃ হ্যাঁ পারি; কাস্টার্ড পুডিং।

প্রঃ খামে লাগানোর জন্যে ডাক-টিকিটটা হাতে নিলাম, তারপর আর খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় যেতে পারে আন্দাজ দিতে পারেন ?

উঃ আপনার জিবের ডগাটা একবার দেখুন তো।

প্রঃ এই কিম্ভূত ছবিটাকে ঝুলিয়ে রেখেছ কেন ?

উঃ ছবির আর্টিস্টকে যে খুঁজে পেলাম না।

সুসেন

মজার খেলা

এবারের মজার খেলার জন্য চাই ছ'টা এক রকমের পয়সা, আর চাই নীচের ছবির মতন একটা ছক। ছকটা তুমি আগেভাগেই একটা সাদা কাগজে এঁকে নিয়ো, তারপর একটা পিজবোর্ডের ওপর সেঁটে দিয়ো। তাহলেই তৈরি হয়ে থাকবে একটা স্থায়ী মজার খেলার ছক।

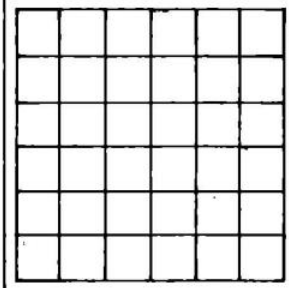

খেলাটা কী এবার শোনো। এই ছকের মধ্যে ছ'টা পয়সাকে এমনভাবে বসাতে হবে যাতে আড়াআড়ি, লম্বালম্বি বা কোনাকুনি—কোনও ভাবেই একটা পয়সা আর-একটা পয়সার সঙ্গে এক লাইনে না পড়ে। এক ঘরে দুটো পয়সাও বসবে না।

এই শর্ত মেনে পয়সা বসাও দেখি। হ্যাঁ, নিজে আগে চেষ্টা করো, তারপর বন্ধুদের দেখাও। বন্ধুরা সবাই পারবে না। আর সেখানেই তো মজা। যারা নিজেরা পারবে না, তাদের জন্য নীচের সমাধানটা দেওয়া হল। সেটা ভাল করে দেখে নাও।

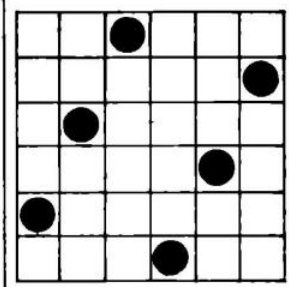

মজারু

হাসিখুশি

"আপনার কাছে আমি মাত্র একটা বিষয়ের পরামর্শ নিয়েছিলাম, উকিলবাবু, কিন্তু আপনি আমাকে দুটো বিল করেছেন।" মক্কেলের প্রশ্নের জবাবে উকিলবাবু বললেন, "আরে মশায়, আপনি তো একবার পরামর্শ নিয়ে চলে গেলেন। তারপর পনেরো মিনিট পরে ফিরে এসে আবার কী যেন জানতে চাইলেন ?" "সে তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম ছাতাটা ফেলে গেছি কি না।" মক্কেলের কথায় উকিলবাবু বললেন, "সেটাও একটা পরামর্শ।"

একজন খুবই মোটা লোককে তাঁর এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার এখন ওজন কত ?" মোটা লোকটি বেশ মাথা চুলকে বললেন, "বলা অসম্ভব। গত কয়েক বছর ধরে যখনই ওজনের যন্ত্রে উঠেছি, ভেতর থেকে কার্ড বেরিয়ে এসেছে, তাতে ওজন ওঠেনি, তার বদলে লেখা আছে, 'একে-একে আসুন'।"

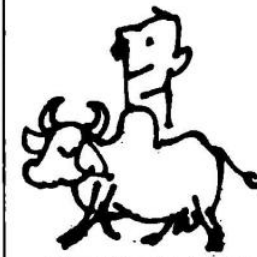

যে-কোনো বড় রাস্তা পার হওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হল একটা গোরুর পাশে-পাশে পার হয়ে যাওয়া।

ছবি : অহিভূষণ মালিক

নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক

কৃষ্ণা বসু

"নিউ ইয়র্ক শহরটা ঠিক যেন কলকাতা," সঙ্গীদের একজন হঠাৎ এরকম মন্তব্য করে বসাতে বেশ চমকে গেলাম। বলে কী! কোথায় কলকাতা আর কোথায় নিউ ইয়র্ক। ভাল বা মন্দ কোনো দিকেই আমি তো কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম না। প্রথম যেবার নিউ ইয়র্ক আসি, শহরটা আমার মনে হয়েছিল যেন বড় রকমের গোরস্থান। এয়ারপোর্ট থেকে শহরে আসতে পথে পড়েছিল এক সমাধিক্ষেত্র, চোখে পড়ছিল সোজা, সার-সার সাজানো পাথরের স্ল্যাব। তারপর গাড়িতে কখন যেন চোখে ঘুম এসে গিয়েছিল। একসময় চোখ

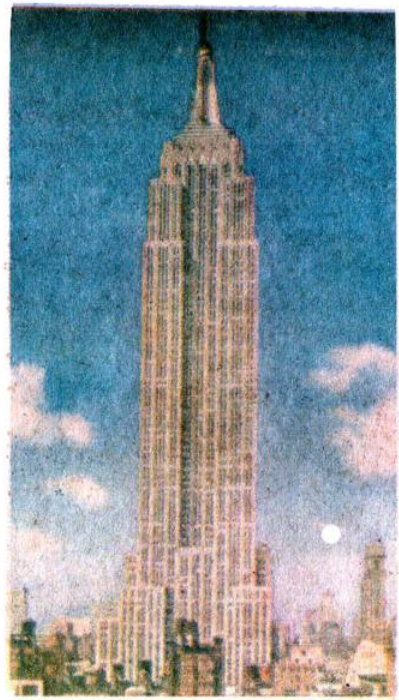

এমপায়ার স্টেট বিল্ডিং

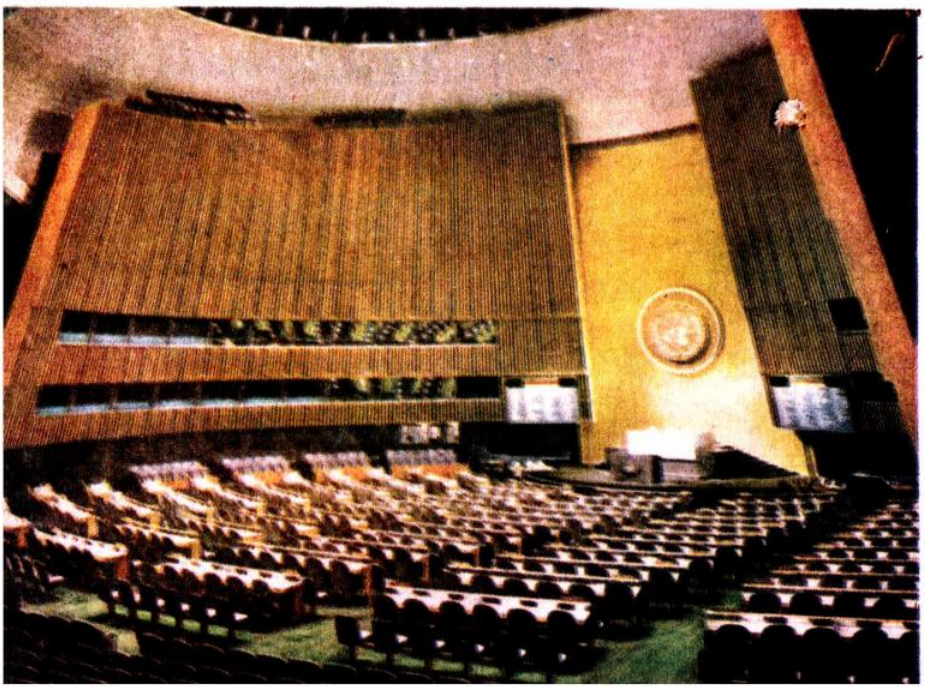

রাষ্ট্রপুঞ্জের জেনারেল এসেম্বলির অধিবেশন-কক্ষ

মেলে দেখি সামনে গোরস্থানের পাথরগুলো বিরাট আকার ধারণ করে আকাশ ফুঁড়ে উঠে গেছে। বুঝতে একটু সময় লাগল যে শহরে পৌঁছে গেছি, আমার সামনে নিউ ইয়র্কের আকাশছোঁয়া ঘরবাড়ি। তার ওপর শহরে পৌঁছেই প্রথমে যাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা তিনি যখন ফোনে বললেন, হ্যাঁ, চলে এসো, আমার আপিস এত নম্বর বাড়ির ছাপ্পান্ন তলায়, তখন মাথাটা একটু ঘুরে গিয়েছিল। সেবার আমি নিউ ইয়র্ক ছেড়ে বস্টন শহরে পালিয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম।

এবার কিন্তু গ্রীষ্মের দুপুরে মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামের সিঁড়িতে বসে সঙ্গীর মন্তব্য "নিউ ইয়র্ক শহরটা ঠিক যেন কলকাতা" একেবারে মিথ্যা মনে হল না। কোথায় যেন একই ধরনের একটা প্রাণচাঞ্চল্য আছে। কলকাতার মতোই গমগম করছে শহরটা। সাধারণত বিলেত আমেরিকার শহর কেমন যেন খাঁ-খাঁ করে। লোকজন তো পথে হাঁটে না, গাড়ি চড়ে হুশ হুশ করে চলে যায়। সন্ধ্যার পর বা ছুটির দিনে আরো নীরব নির্জন লাগে সব কিছু। কিন্তু এখন চারিদিকে জনস্রোত। একটু আগেই মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্ট-এর ঘরে ঘরে কত চিত্রকলা ঘুরে ঘুরে দেখেছি। বাইরে এসে ক্লান্ত হয়ে সিঁড়ির ওপর বসে পড়েছিলাম। চেয়ে দেখি চারপাশে আরো কত লোক বসে আছে। অনেকের হাতে মিউজিয়ামের নাম লেখা প্যাকেট, ছবির প্রিন্ট কিনেছে নিশ্চয়। সিঁড়ির একধারে একর্ডিয়ান বাজিয়ে গান ধরেছে একজন। তাকে ঘিরে উৎসুক জনতা গান শুনছে, সামনে রাখা টুপিতে পয়সাও ফেলছে টুং-টাং। আবার ঠিক সামনে ফুটপাথে, ওরা বলে সাইড ওয়াক, এক ম্যাজিকওয়ালা ম্যাজিক দেখাচ্ছে, তাকে ঘিরেও বেশ হল্লা। অন্য পাশে একটা ঠেলাগাড়িতে অনেক হট্‌ডগ্‌ রাখা আছে, সবাই কাড়াকাড়ি করে কিনে খাচ্ছে। গাড়ির মাথায় রঙিন ছাতা, তার ওপর লেখা "ইয়াম্‌ ইয়াম্‌ হট্‌ডগ"। ওটা যদি ঐ ইয়াম্‌ ইয়াম্‌ না হয়ে ফুচকা হত, তবে পরিবেশটা সত্যি কলকাতা হয়ে যেত।

মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট-এ জোন মিরোর ছবি

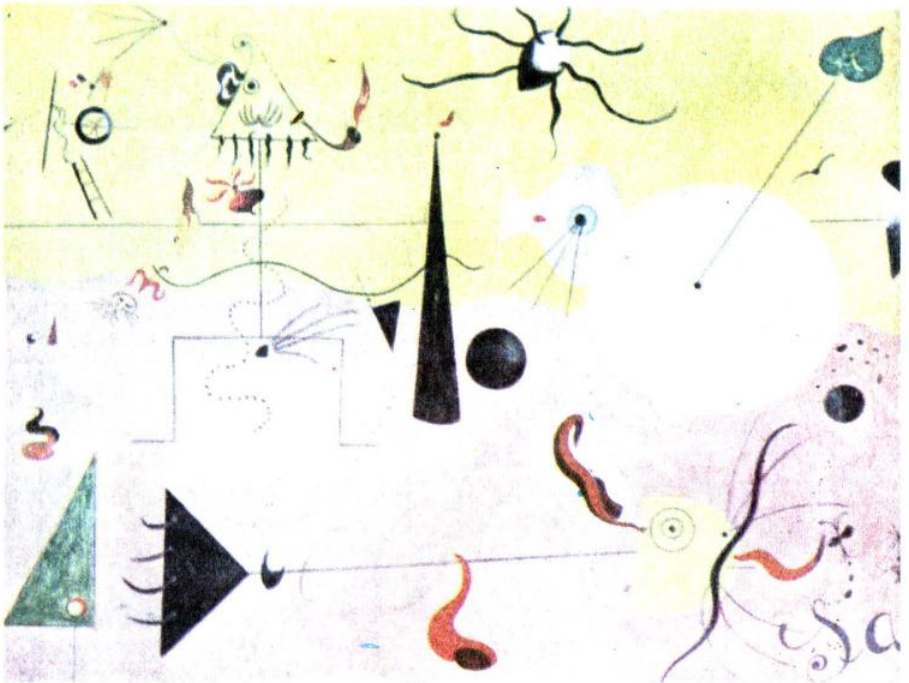

যে কারণেই হোক এবার নিউ ইয়র্ক শহরটা আগের চাইতে ভাল লাগল বেশি। শীতকালে ওভারকোটের তলায় চাপা পড়ে যায় সব রঙ। এখন যেদিকে চাই রঙিন পোশাকের ছড়াছড়ি। সবাই পথে নয়তো সেন্ট্রাল পার্কে রোদ্দুর পোহাতে বেরিয়ে পড়েছে। আমরাও ঘুরে বেড়াতে লাগলাম পথে পথে।

গ্র্যাণ্ড সেন্ট্রাল স্টেশনে নেমে খুব কাছেই ৪৩ নম্বর স্ট্রীটে যাব। তা হাতে দুটো ভারী বাক্স থাকাতে ট্যাক্সিতে উঠলাম ক'জন, আর দলের অন্যরা হেঁটে চলে গেল। পাঁচ মিনিটের পথ। খানিক পরে দেখি আমরা কেবলই একই পথে চক্কর দিয়ে চলেছি। সেদিন আমার গাইড যদিও অনেকদিনের নিউ ইয়র্ক-বাসিনী বান্ধবী স্নিগ্ধা, কিন্তু আমাদের গল্প করার সুযোগে ট্যাক্সি ড্রাইভার এই কাণ্ডটি বাধিয়েছে। 'হাঁ-হাঁ করো কী,' বলতে বলতে সে 'এদিকে সব রাস্তা ওয়ান ওয়ে' বলে আরো কয়েক চক্কর মিছিমিছি ঘুরিয়ে দিল। বিরক্তির মধ্যেও আমার মনে এক ধরনের আনন্দ হল। ওদেশের বন্ধুরা মাঝেমাঝেই আমাদের বলে দমদম থেকে গ্র্যাণ্ড হোটেল বা গোলপার্কের কালচারাল মিশনের গেস্ট হাউসে নিয়ে আসার সময় ওদের নাকি এরকম মিথ্যে ঘোরানো হয়। এবার তো আমরাও বলতে পারব তোমাদেরই বা কী রকম ব্যবহার! আবার মনটা একটু খারাপও হল। সেই আগে যখন এসেছিলাম, নিউ ইয়র্কের ট্যাক্সি ড্রাইভার আমার সঙ্গে গান্ধীজি ও ভারতীয় রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছিল। বলেছিল "গ্যাণ্ডির মতো গুড্ গাই (অর্থাৎ, চমৎকার মানুষ) তাঁকেও তোমরা হত্যা করলে, ছি!"

এবার উঁচু বাড়ি দেখে ভয় পেলাম না। একদিন উঠে পড়লাম বিখ্যাত এমপায়ার স্টেট বিল্ডিং-এ। এ-বাড়িটা একশো দুই তলা। একতলাতে লোকজনের ভিড়, দোকানপাট। এলিভেটর বা লিফটে চড়ে ধীরে ধীরে উঠে এলাম ছিয়াশি তলায়। সেখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারলাম কেন এই আকাশছোঁয়া বাড়িকে বলে 'ক্যাথিড্রেল অব দি স্কাইজ'। কাঁচে ঢাকা বারান্দা থেকে এক একদিকে তাকালে শহরের এক একরকম রূপ চোখে পড়ে। চারদিকে দূরবিন লাগানো, যন্ত্রের মধ্যে পয়সা ফেলে দিয়ে চোখ লাগালে হঠাৎ স্ট্যাচু অব লিবার্টি বা ইউনাইটেড নেশনস্-এর বাড়ি মস্ত বড় হয়ে ভেসে উঠছে। ভিড়ও খুব। লিফট-বোঝাই দর্শক উঠে আসছে। একশো দুইতলার মাথার ওপর রয়েছে পৃথিবীর সব চাইতে বড় টেলিভিশন টাওয়ার। টাওয়ারের দৈর্ঘ্য জুড়ে দিলে উচ্চতা হবে চোদ্দশো বাহাত্তর ফীট। আশি লক্ষ টি ভি সেট শুনলাম এই টাওয়ারের দৌলতে চলে।

নিউ ইয়র্ক এসে ইউনাইটেড নেশনস বা রাষ্ট্রপুঞ্জের বাড়িতে একবার যেতেই হয়। ও বাড়িটা ভুল হবার উপায় নেই, সামনে পত্‌পত্ করে উড়ছে কত না দেশের পতাকা। সেই ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে পর একান্নটি রাষ্ট্র মিলে রাষ্ট্রপুঞ্জের পত্তন করেছিল। আজ তার সদস্যসংখ্যা বেড়ে হয়েছে তিনগুণ। যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে এমনি এক সদিচ্ছা থেকেই এর জন্ম। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জের আছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

সব সদস্য-রাষ্ট্র যেখানে বসে আলাপ-আলোচনা করেন তাকে বলে জেনারেল এসেম্বলি। বিরাট হল-ঘরে বসবার আসন রয়েছে দু'হাজার। মঞ্চের ওপর তিনটি চেয়ার। একটিতে সেই সেশনের জন্য নির্বাচিত সভাপতি বসেন। অন্যদুটিতে সেক্রেটারি-জেনারেল আর আণ্ডার সেক্রেটারি। দুপাশের দেওয়ালে ফরাসি চিত্রকরের আঁকা বিরাট দেওয়াল-চিত্র। ভোটাভুটির সময় সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে খুব উত্তেজনা হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পেতে হবে।

এরপর রয়েছে সিকিউরিটি কাউনসিলের অধিবেশনের হলঘর। টেবিল ঘিরে কাউনসিলের পনেরোজন সদস্যের নাম লেখা চেয়ার সাজানো। পাঁচজন স্থায়ী সদস্য হল আমেরিকা, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও চীন, বাকি দশ জন প্রতি দু-বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। স্থায়ী সদস্যদের ক্ষমতা যে অনেক, তা আমরা খবরের কাগজে পড়ি। এঁদের একজন 'ভেটো' দিলেই যে-কোনো প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। এ-ঘরের সাজসজ্জা প্রস্তুত করেছেন নরওয়ের শিল্পীরা।

আরো দু-একটা ঘর, যেমন ট্রাস্টিদের কাউনসিল, ইকনমিক ও সোশ্যাল কাউনসিল দেখে নীচে লবিতে নেমে এলাম। সেখানে

সেদিন চাপা উত্তেজনা। একটু আগে ছোরা হাতে একজন বাইরের লোক ধরা পড়েছে শুনলাম। একটু আগে কেন এলাম না ভেবে আক্ষেপ হয়েছিল। তখন জানতাম না পরে একদিন আক্ষেপ মিটে যাবে।

একদিন হাঁটতে হাঁটতে আমেরিকান বন্ধুরা নিয়ে এলেন নিউ ইয়র্কের একটু কম ফ্যাশনেবল্ এলাকাতে। কলম্বাস এভেনিউয়ের ওপর পর পর কয়েকটা ডাস্টবিন চোখে পড়ল যেগুলো থেকে জঞ্জাল উপচে পড়ছে রাস্তায়। আমের খোসা বা কাঁঠালের ভুতি না থাকলেও সুপার মার্কেটের ছেঁড়া ঠোঙা, আইসক্রীমের কার্টন, টিনের খাবারের ফেলে দেওয়া টিন—এমনি নানারকম আবর্জনা। অন্যদিকটা আবার দেওয়াল জুড়ে পোস্টার মেরে কুৎসিত করে রাখা হয়েছে। আমরা মহোৎসাহে এইসবের ছবি তুলছি দেখে আমাদের অনেকবার কলকাতা ঘুরে আসা আমেরিকান বন্ধু একটু মুচকি হাসলেন।

তাই বলে শুধু কি আর ডাস্টবিনই দেখলাম। ওরই মধ্যে গাগেনহাইম মিউজিয়াম দেখা হয়ে গেল। ছবি ছাড়া মিউজিয়ামের বাড়িটাই তো একটা দ্রষ্টব্য। আর একদিন সারা সকাল কাটল মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট-এ। আধুনিক ছবি বুঝতে তো একটু কঠিন হবেই। বেশ কয়েকটা জ্যাকসন পোলকের আঁকা দেখলাম। ক্যানভাসের ওপর উপুড় করে রঙ ঢেলে দিয়ে তার ওপর হাঁটাচলা করে, লাঠি পিটিয়ে একধরনের প্যাটার্ন সৃষ্টি করতেন। আবার জোন মিরোর ছবি যেন আমাদের আলপনার ধরনের। একটা বিশেষ প্রদর্শনীতে তখন পিকাসোর বিখ্যাত ছবি গুয়েরনিকা দেখানো হচ্ছিল।

মডার্ন আর্ট অনেকক্ষণ ধরে দেখা যায় না। বাইরে গিয়ে কফি নয়তো আইসক্রীম খাওয়া যাক—কথা হল। সবাই আইসক্রীম-বিশারদ, নামী আইসক্রীমের মধ্যে কোন্‌টা ভাল—বাস্‌কিন রবিনসন না হাগেনদাস, এইসব আলোচনা করতে করতে নীচে নেমে এসে চমকে গেলাম।

রিসেপশন ডেস্কের কাছে একটি লোক ক্রুদ্ধ গলায় চিৎকার ও তর্জন-গর্জন করছে। তার হাতে চকচক করছে এক রিভলভার। সে নাটকীয় ভাবে বলছে, "হ্যাঁ, আমি রিভলভার নিয়ে ঘুরছি, বেশ করেছি, তোমার তাতে কী! আমার রাইট আছে রিভলভার সঙ্গে রাখার।" লোকটি ইংরেজি বলছে একদম আমেরিকান উচ্চারণে। কিন্তু পরনে আমাদের আলিগড়ি পাজামার মতো পাজামা আর লম্বা ঝুলওয়ালা শার্ট। ইরানি হতেও পারে। তাকে ঘিরে আছে তিনজন সিকিওরিটির ষণ্ডামার্কা লোক।

তারা খুব বিনীতভাবে মৃদু গলায় বলছে, "রিভলভারটা ডেস্কে জমা দিয়ে দিন, প্লীজ!" ওরা একেবারে উত্তেজিত হচ্ছে না। লোকটির গায়ে হাতও দিচ্ছে না। শুধু চারপাশে পজিশন নিয়ে আছে। ও যেমন যেমন ঘুরছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। একসময় লোকটি হঠাৎ দরজার দিকে এক ছুট দিল, পালাবার ব্যর্থ চেষ্টা। চোখের পলক ফেলতে না-ফেলতে দুজন ওকে ধরে ফেলল আর ওর হাতের রিভলভার দেখি চলে এসেছে তৃতীয় জনের হাতে। পুরো ব্যাপারটা এমন মোলায়েম ভাবে হল কী বলব! ওকে ধরে এনে ডেস্কে বসিয়ে দিয়ে পুলিশে ফোন করা হল। লোকটি অবশ্য তখনো তর্জন-গর্জন করেই চলেছে।

এতক্ষণ ভয়ে ভিড়ের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। শুনেছি আমেরিকান খুনিরা ভারী অদ্ভুত হয়। কেউ হয়তো শুধু সোনালি চুলওয়ালা লোকজনকে আক্রমণ করে, অন্যদের কিছু বলে না। বলা তো যায় না, এর আবার হয়তো শখ হল—শাড়িপরা মহিলাকেই রিভলভার তাক করি। এবার এদিক-ওদিক দেখে বেরিয়ে পড়লাম। এলিটে বা মেট্রোতে বসে নয়, চোখের সামনে জলজ্যান্ত আমেরিকান সিনেমার দৃশ্য দেখা হয়ে গেল।

হাগেনদাস-এর বিখ্যাত আইসক্রীম খেতে খেতে নিউ ইয়র্ক শহরটা সত্যিই কলকাতার মতন কি না এ-প্রশ্নের জবাব খুঁজতে লাগলাম।

ভিক্টর হুগোর লেখা একটি চিঠি পৃথিবীর সংক্ষিপ্ততম চিঠি। তিনি তাঁর বিখ্যাত বই 'লা মিজারেবল'-এর বিক্রি সম্বন্ধে বইটির প্রকাশককে একবার একটি চিঠি লেখেন—পুরো চিঠিটিতে শুধু একটি 'জিজ্ঞাসা-চিহ্ন' ছাড়া আর কিছুই ছিল না। প্রকাশক এর উত্তরে হুগোকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তাতে ছিল একটি 'বিস্ময়-চিহ্ন'। অর্থাৎ, কেমন বিক্রি হচ্ছে, না দারুণ!

আমাদের বাড়ি

মিস্ত্রিরা যখন আমাদের বাড়িটা তৈরি করছিল তখন সেখানে ছিল শুধু ইঁট, বালি, সিমেন্ট আর দাঁত-বের-করা দেয়াল। আমি রোজ একবার করে দেখতে আসতাম।

এখন সেখানে বাড়ি। দুটো শোবার ঘর। একটার এখনও মেঝে হয়নি, দরজা হয়নি। ছাতের সিঁড়ি হয়েছে। আমি রোজ সকালে মুখে ব্রাশ নিয়ে ছাতে যাই। কী সুন্দর সকাল!

পুবদিকের জানলা খুললেই ঘরে রোদ আসে। সিঁড়ির ঘর হয়নি বলে ভেতরের দালান থেকে আকাশ দেখা যায়। রাত্রে জ্যোৎস্না পড়ে। বাড়িতে জলের লাইন এখনও হয়নি। অনুকূল ভারী বাঁকে করে জল দেয়। বাড়ির ভেতরে ঢুকতে না পেরে একটা বেড়াল মন খারাপ করে রান্নাঘরের পাশের পাঁচিলে বসে থাকে।

তীর্থ ভৌমিক (বয়স ১৪)

ছবি এঁকেছে তন্ময় সামন্ত (বয়স ৮)

গুরুজন

বড়মামা ছাদে রোজ পায়রা ওড়ান
সেজমামা মুরগিকে খাবার ছড়ান
দীপালিদি আমাদের বাংলা পড়ান
বাপি এসে রাত্তিরে অঙ্ক করান
না পারলে চোখ থেকে জলও ঝরান।

সহেলি মুখোপাধ্যায় (বয়স ৬)

ছবি এঁকেছে পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১১)

লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরি

সুব্রত সিংহ

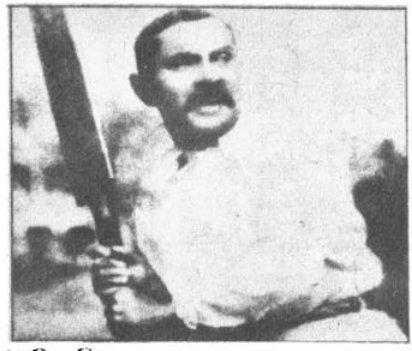

রণজিৎ সিং

সদ্যসমাপ্ত অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ড টেস্ট সিরিজের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেল ক্রাইস্টচার্চের তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের আগে মাত্র একানব্বুই মিনিটে ঠিক একশো রান করে 'লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরিকারী'দের দলভুক্ত হন। তিনি হলেন ওই দলের চতুর্দশ সদস্য। তাঁর আগে আরো তেরোজন খেলোয়াড় বিভিন্ন দিনে এই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

প্রথম দিনে যে চারজন এই কৃতিত্ব অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে তিনজন অস্ট্রেলিয়ার, একজন পাকিস্তানের। অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টর ট্রামপার হলেন প্রথম খেলোয়াড় যিনি প্রথম দিনেই ওই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার এই বিখ্যাত ব্যাটসম্যান ১৯০২ সালে ম্যানচেস্টারে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ১১৩ মিনিটেই ১০৩ রান করেছিলেন। আর-এক অস্ট্রেলীয় চার্লস ম্যাকার্টনে ১৯২৬ সালে লীডসে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দিনের লাঞ্চের আগে ট্রামপারের সেঞ্চুরি-রেকর্ডটি স্পর্শ করেন। তিনি করেছিলেন ১১২ রান। এর চারবছর বাদে প্রথম দিনের তৃতীয় নজিরটি স্থাপন করেন বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ওপেনিং ব্যাটসম্যান স্যার জন ব্র্যাডম্যান। তিনিও লীডসে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দিন লাঞ্চের আগেই তাঁর সেঞ্চুরিটি করেছিলেন। এ ছাড়া ওই টেস্টে তিনি একদিনে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান (৩০৯) এবং তাঁর টেস্ট-জীবনের সর্বোচ্চ রানের (৩৩৪) রেকর্ডটিও করেছিলেন। ব্র্যাডম্যানের পর পাকিস্তানের মজিদ খান হলেন চতুর্থ খেলোয়াড় যিনি ১৯৭৬ সালে করাচিতে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনে অনুরূপ কৃতিত্ব অর্জন করেন। লাঞ্চের আগে তিনি একশো আট রান করে অপরাজিত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিন যে চারজন লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন ইংল্যাণ্ডের জ্যাক হবস ও ওয়ালি হ্যামণ্ড। হবস ১৯২৪ সালে লর্ডসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এবং হ্যামণ্ড অকল্যাণ্ডে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩২-৩৩ সালে ওই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। এই দুজন ছাড়া ইংল্যাণ্ডের আর-এক ব্যাটসম্যান ফিল মীড ১৯২১ সালে ওভালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের আগে করেছিলেন ১০৯ রান। অস্ট্রেলিয়ার ডবল্যু বারডস্‌লে দ্বিতীয় দিনে কৃতিত্ব-অর্জনকারী চতুর্থ খেলোয়াড়। তিনি ১৯১২ সালে লর্ডসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওই কৃতিত্ব দেখান।

সর্বপ্রথম যিনি এই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তিনি হলেন রণজিৎ সিংজি। তাঁর নামেই আমাদের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা রণজি ট্রফি। ১৮৯৬ সালে ম্যানচেস্টারে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনে তিনি ওই গৌরবের অধিকারী হন। ওই খেলাতেই তাঁর টেস্ট-অভিষেক হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান ক্লেম হীল ১৯০২ সালে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম টেস্টে তৃতীয় দিনে লাঞ্চের আগে করেছিলেন ১১৬ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার এইচ· জি· ওয়েল স্মিথ এই কীর্তিমানদের মধ্যে অষ্টম। তৃতীয় দিনে লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরি করা আর -এক খেলোয়াড় ইংল্যাণ্ডের উইকেটরক্ষক লেসলি এমস্‌। তিনি ১৯৩৫ সালে ওভালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওই কৃতিত্বের অধিকারী হন।

১৯৩৫-৩৬ সালে জোহানসবার্গে অস্ট্রেলিয়ার স্ট্যান ম্যাকেব চতুর্থ দিনে লাঞ্চের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেন। চতুর্থ দিনের এই রেকর্ডটি একমাত্র তাঁরই।

টস জিতে ফীল্ডিং

অশোক রায়

যে-কোনো টেস্ট ম্যাচ শুরুর ঠিক আধ ঘণ্টা আগে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ক্যাপ্টেন, উপস্থিত দর্শক, রেডিও এবং টি·ভি· কমেন্টেটররা যে-ব্যাপারটির প্রতি সবচেয়ে বেশি আগ্রহ বোধ করেন সেটি হল 'টস'। মানতেই হবে, টস জেতার একটা বাড়তি গুরুত্ব আছে। উইকেট, আবহাওয়া, স্বদলের শক্তি, বিপক্ষের সামর্থ্য ইত্যাদি ব্যাপারগুলো ভালভাবে পর্যালোচনা করে একজন বিচক্ষণ অধিনায়ক স্থির করেন, দলের পক্ষে কোন্‌টা সুবিধেজনক হবে—ব্যাটিং না ফীল্ডিং। সাধারণত টসজয়ী দলই প্রথমে 'ফ্রেশ' উইকেটে ব্যাট করতে চান। কিন্তু ইদানীং (বিশেষ করে ১৯৬৩ সালে ইংল্যাণ্ডে গিলেট কাপ চালু হবার পর থেকেই) অনেক ক্যাপ্টেনের মধ্যেই টস জিতে ফীল্ডিং নেবার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। সম্ভবত বিপক্ষের ওপর একটা মানসিক চাপ সৃষ্টি করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এমন চাল চেলে প্রতিপক্ষকে জব্দ করেছেন কেউ-কেউ, আবার ঠকেছেনও অনেকে।

অস্ট্রেলিয়ার গ্রেগ চ্যাপেল টস জিতে ফীল্ডিং নেবার ক্ষেত্রে একটি বিশ্ব-রেকর্ড গড়েছেন।

গ্রেগ চ্যাপেল

'মুদ্রা'-ভাগ্যে জয়ী গ্রেগ প্রতিপক্ষকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছেন দশ বার (বিশ্ব-রেকর্ড)। এর মধ্যে ছ-বার ম্যাচ জিতেছেন। এবং হেরেছেন দু-বার। হয়তো শুনতে খুবই ভাল লাগবে, ওই দুটির মধ্যে একটি আঘাত ভারতেরই দেওয়া। গত ফেব্রুয়ারিতে মেলবোর্নে ভারতকে আগে ব্যাট করতে পাঠিয়ে বেকায়দায় পড়ে হার মেনেছিল অস্ট্রেলিয়া মূলত কপিলদেবের দুর্ধর্ষ বোলিং আর বিশ্বনাথের দর্শনীয় ব্যাটিংয়ের জোরে।

সংখ্যার দিক দিয়ে গ্রেগ চ্যাপেলের ঠিক পেছনে থাকলেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্লাইভ লয়েডের ব্যক্তিগত সাফল্যের রেকর্ডটিও কিন্তু রীতিমত আকর্ষণীয়। লয়েড বিপক্ষকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছেন মোট আটবার। এর মধ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাত্র একটি টেস্টে হার মানলেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে জয় এনে দিয়েছেন তিন-তিনবার।

দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে এইচ· জি· ডীনের রেকর্ডটি একটু অদ্ভুত ধরনের। ১৯২৭-২৮ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজে ডীন টস জিতে ইংল্যাণ্ডকে ব্যাট করতে দিয়েছিলেন তিনবার।

ভারতের পক্ষে সাতজন অধিনায়ক টস জেতার পরে বিপক্ষের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য এঁদের মধ্যে একজনও ম্যাচ জেতার সাফল্য লাভ করতে পারেননি! ভারতের পক্ষে মনসুর আলি পতৌদি বার-ছয়েক টস জিতে ফীল্ডিং নিয়ে চারটি 'হার' এবং দুটি 'ড্র'-এর মধ্যে আবদ্ধ থেকেছেন। তবে অন্যান্য দেশের হার-মানা ক্যাপ্টেনদের তালিকাটিও কম বড় নয়। আর্চি ম্যাকলারেন, পার্শি চ্যাপম্যান, বব ওয়েট, লেন হাটন, পিটার মে, আর্থার মরিস, ফ্রাঙ্ক ওরেল, বার্ট সাটক্লিফদের দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনার কিছু উপকরণ হয়তো পাওয়া যাবে।

এ-লেখা শেষ করার সময়ও একজন অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপ্টেনকে মনে না রেখে উপায় নেই। ১৮৯৪-৯৫ সালে জর্জ গিফেন সর্বপ্রথম টস জিতে ফীল্ডিং করার যে বাড়তি ঝুঁকি নিয়েছিলেন উত্তরকালের ক্যাপ্টেনদের অনেকেই আজও টেস্ট ক্রিকেটে সেই ঝুঁকি নিচ্ছেন। ঝুঁকি নিয়ে কেউ হারছেন, কেউ জিতছেন।

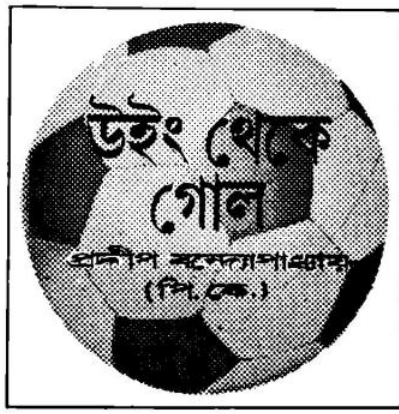

॥ ৪৬ ॥

হাঙ্গারির সঙ্গে হারার দিন ডিনারে দুই দলেরই নেমন্তন্ন ছিল। ককটেল ডিনার। কিন্তু রহিমসাহেব খুব কড়া লোক, তাই আমাদের টিমের দু'একজন রসিক খেলোয়াড়কেও স্রেফ লেবুর জল খেয়ে সন্ধেটা কাটাতে হল। খাওয়াদাওয়া অবশ্য ভালই জমল। ভাল খেলার জন্য অনেকে আমাদের অভিনন্দন জানালেন। কিন্তু রহিমসাহেবের মুখে হাসি নেই। তাঁর ঐ এক কথা! জেতা ম্যাচটা হাতছাড়া হয়ে গেল!

পরদিন রোমের অলিম্পিক ভিলেজে বসে খবর পেলাম, আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য কয়েকজন নাকি মেন গেটে দাঁড়িয়ে আছেন। এই দূর বিদেশে কারা আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন?

দেখলাম, অতিথি দলের নেতা জামশেদপুরের হীরক মৈত্র। জামশেদপুরের ক্রিকেটার হিসেবে পুঁটু চৌধুরী, সুটে ব্যানার্জি, বিমল বসু, সুধীর দাস এবং তারা ব্যানার্জির মতো হীরক মৈত্রও যথেষ্ট খ্যাতিমান ছিলেন।

হীরকদা বললেন, "লণ্ডন থেকে বন্ধুদের নিয়ে তোমাদের খেলা দেখতে এলাম। দ্যাখো, ওখানকার কাগজে কী লিখেছে!"

সব কাগজেই ভারত-হাঙ্গারি ম্যাচের রিপোর্টে আমাদের টিমের দারুণ প্রশংসা করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি প্রশংসা পেয়েছে জার্নেল সিং। একজন ঝুঁটিওয়ালা ভারতীয় ফুটবলার যে আলবার্তোর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুটবলারকে বোতলবন্দী করে রাখতে পারেন, ইংরেজ সাংবাদিকরা নাকি স্বচক্ষে না দেখলে তা বিশ্বাস করতেন না!

মেলবোর্নে ভারত ফুটবলে সেমিফাইনালে ওঠায় কর্মকর্তারা খুব খুশি হয়েছিলেন। এবার তাঁদের আরও উচ্ছ্বসিত মনে হল। ভাইস শেফ-দ্য-মিশন অশ্বিনীকুমার আড়াই শো মাইল দূরে গেলেন ভারত-ফ্রান্স ফুটবল ম্যাচ দেখতে।

ফ্রান্স পেরুকে ৫-১ গোলে হারিয়েছিল। এই শক্তিশালী টিমের বিরুদ্ধে আমরা একটি অসাধারণ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেললাম। হাঙ্গারির বিরুদ্ধে আমরা ভাল খেলেছিলাম। কিন্তু ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আমাদের খেলা অপ্রত্যাশিত উচ্চতায় উঠে গেল।

কলকাতায় প্রি-অলিম্পিকে ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে উইথড্রয়াল সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে কানন চমৎকার খেলেছিল। কিন্তু হাঙ্গারির বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারল না। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তাই ইউসুফ খানকে সেন্টার ফরোয়ার্ড করা হল। মাঝখানের দায়িত্ব নিল কেম্পিয়া এবং রাম বাহাদুর।

হাঙ্গারির বিরুদ্ধে লেফট ব্যাক লতিফও খুব খারাপ খেলেছিলেন। কুণ্ঠা নিয়েই আমি প্রস্তাব করলাম, "লতিফের স্পিড কমে গেছে। ওর জায়গায় নতুন ছেলে অরুণ ঘোষকে নামালে ভাল হয়।"

রহিমসাহেব এমনিতে আমাকে খুব ভালবাসতেন। আমাকে বলতেন, 'ওস্তাদ'। থঙ্গরাজকে বলতেন 'রাজা'। চুনীকে 'চুন্নী'।

ভালবাসলে কী হবে, আমার প্রস্তাবকে কিন্তু রহিমসাহেব আমলই দিলেন না। বললেন, "অরুণ ভাল প্লেয়ার; কিন্তু এখনও অলিম্পিক ম্যাচ খেলার যোগ্য হয়নি।"

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধেই গোলের সুযোগ নষ্ট করল ইউসুফ, চুনী আর বলরাম। তিনজনেই কিন্তু দারুণ খেলছিল।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল। বলরাম বল ধরে পায়ে রাখলে অনেক সময়েই আমি পেনাল্টি বক্সের দিকে কোনাকুনি ছুটে যেতাম। ডিফেণ্ডাররা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ব্যাপারটা ঘটে যেত। বলরাম সুযোগ বুঝে রাইট ব্যাক আর স্টপারের মাঝখানে বল রাখত।

বলরাম বল ধরল। আমি স্টার্ট দিতেই চুনী রাইট উইংয়ের দিকে সরে এল। এবং রাম

চুনী গোস্বামী

বাহাদুর গেল লেফট উইংয়ের জায়গায়। বলরাম অল্পসময় পায়ে বল রেখে চিপ করে রামের পায়েই বল দিল। রাম বলতে গেলে আন্দাজেই লেফট ইনের জায়গায় বল বাড়াল। আমি ঢুকছি; ডানদিকে গোল। অনুভব করলাম, ডান দিক থেকেই কে যেন ঝড়ের বেগে আমার দিকে আসছে। বুঝলাম, বল থামাতে গেলে বিপদ অনিবার্য। চলতি বলেই আউটসাইড মারলাম। যেন একটা মিলিটারি ট্যাঙ্ক আমার গায়ে ধাক্কা মারল। ছিটকে মাটিতে পড়লাম। গজ দুয়েক দূরে ফ্রান্সের গোলকিপারও মাটিতে। গোল! চুনী-বলরাম-সাইমন-ইউসুফ-রাম-কেম্পিয়া জার্নেল সকলে মিলে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরল। জার্নেলের দাড়ির আদরে আমার অবস্থা কাহিল হল, বলাই বাহুল্য।

এক গোলে এগিয়ে গিয়ে আমাদের আক্রমণ আরও বেড়ে গেল। খেলা শেষ হতে যখন মিনিট পনেরো বাকি, কেম্পিয়া আমার দিকে একটা পরিষ্কার পাস বাড়াল। বলরাম লেফ্‌ট ইনসাইডের জায়গা থেকে ভিতরে ঢুকে আসছিল, আমি ওর দিকে বল ঠেললাম ইনসাইডের জায়গায়। রাইট ইনসাইড চুনী ততক্ষণে চলে গেছে লেফট ইনসাইড বলরামের জায়গায়। বলরামের যেন পিছনেও চোখ ছিল, আমার ঠেলে দেওয়া বল না ধরে ও চুনীর জন্য ছেড়ে দিল। চুনী অনেক ভাল জায়গায় ছিল। ওর সামনে শুধু ফ্রান্সের অসহায় গোলকিপার। আমি চিৎকার করলাম, "চুনী, মার্!" বলরাম চিৎকার করল, "চুনী, মার্!"

চুনী কিন্তু ভাবল, গোলকিপারকে কাটিয়ে গোল করবে। আমাদের চিৎকার কানেই ঢুকল না, কারণ তখন চুনীর রোখ চেপে গেছে। হাত তুলে আমাদের যেন বলতে চাইল, 'ঘাবড়াস না, গোল হবেই।' ফ্রান্সের গোলকিপার সামনেই দাঁড়িয়ে মরিয়া বাঘের মতো, চুনী যেন বিদ্যুৎ-চাবুক হাতে সার্কাসের ওস্তাদ ট্রেনার!

গোলকিপার হঠাৎ জ্যামুক্ত তীরের মতো ছিটকে এল চুনীর দিকে, তার হাত চুনীর পায়ের কাছে। চুনী চোখের পলকে ইনসাইড ডজ্ করল। তারপর যা দেখলাম, তা সত্যিই অবিশ্বাস্য। গোটা শরীর হাওয়ায় ঘুরিয়ে ভাসিয়ে সেই গোলকিপার চুনীকে ট্যাক্‌ল্ করল। চুনী দ্রুত আর-একটি ডজ করতে যেতেই আবার ট্যাক্‌ল্—এবার জোড়া পায়ে। চুনী ছিটকে পড়ল, ছয় গজ দূরে ঝাঁপিয়ে বল তুলে নিল গোলকিপার। চুনী প্রায় আর্তনাদ করে উঠল "ইশ, অলিম্পিক গোল পেলাম না!"

এই ধরনের পরিস্থিতিতে গোলকিপার অসাধ্যসাধন করে ফেলতে পারে, কারণ তার হারানোর কিছুই থাকে না। কান্নায় ভেঙে-পড়া চুনীকে আমরা তুললাম। নিজের ওপর আস্থা একটু কম থাকলে (সাধারণ ফুটবলারদের মতো) ও নিশ্চয় গোলটা পেত।

এর পরেই ফ্রান্স মারাত্মকভাবে আক্রমণে ফিরে এল। তিরাশি মিনিটের মাথায় সেই লতিফের দিক দিয়েই ফ্রান্সের রাইট আউট দুর্দান্ত গোল করে গেল। ১-১। শেষ সাত মিনিট আক্রমণ-প্রতিআক্রমণে খেলা দারুণ উত্তেজনা ছড়াল। খেলার পর অশ্বিনীকুমার আর কে·কে·দাস অভিনন্দন জানালেন।

ফ্রান্সের কোচের সঙ্গে দাসসাহেবের একটু তর্কই হয়ে গেল। কে·কে·দাস বলেছিলেন, এই ম্যাচ ভারতের ৬-১ গোলে জেতা উচিত ছিল।

ফ্রান্সের কোচ বললেন, "এটা ক্রিকেট নয়। সব চান্স থেকেই গোল হলে ক্রিকেটের মতো স্কোর হয়ে যেত!"

এত আনন্দের মধ্যেও রহিমসাহেবের মুখে হাসি ফুটল না। বললেন, "এই ম্যাচটা তোমরা পাঁচ গোলে জিততে পারতে। নিজেদের দোষে ড্র করলে।"

পরের ম্যাচ পেরুর বিরুদ্ধে। প্রথম দুটি ম্যাচেই খুব ভাল খেলায় প্রচুর সুনাম হল। কিন্তু মাত্র এক পয়েন্ট পাওয়ায় নক আউট স্টেজে যাওয়ার সম্ভাবনা আর ছিল না। প্র্যাকটিস অবশ্য পুরোদমেই চালু থাকল।

পেরুকে হাঙ্গারি আর ফ্রান্স সহজেই হারিয়েছে। তাই আমরা ভেবেছিলাম, জিততে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু, কী আশ্চর্য, প্রথমার্ধেই আমরা ০-২ গোলে পিছিয়ে পড়লাম। রাত্রে খেলা, তার ওপর বৃষ্টি। এমন অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না। সবারই অসুবিধা হচ্ছিল।

সাতাশ মিনিটে আমাদের আক্রমণ ভেঙে প্রতিআক্রমণে এল পেরু। এবং প্রায় মাঝমাঠ থেকে পেরুর লেফট আউট শট নিল। চন্দ্রশেখরের মাথা টপকে থঙ্গরাজের সামনে বল পড়ল। হঠাৎ কেন যেন থঙ্গরাজ পড়ে গেল; বল গোলে!

তারপর, লতিফের মিসকিক থেকে বল পেয়ে ওদের রাইট উইঙ্গার সেন্টার করতেই সেন্টার ফরোয়ার্ড ফ্লাইং হেডে গোল করল। পেরু ২ ভারত ০।

দ্বিতীয়ার্ধে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বলরাম, চুনী আর ইউসুফ বল দিয়ে-নিয়ে এগিয়ে সাইমন সুন্দররাজকে দিতেই, সাইমন দূরূহ কোণ থেকে অনবদ্য গোল করল।

আমরা দ্বিতীয় গোলটাও শোধ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলাম। কিন্তু এইদিনই থঙ্গরাজ খেলল ওর জীবনের সবচেয়ে খারাপ ম্যাচ। পেরুর লেফট আউটের একটা দুর্বল শট ড্রপ খেয়ে থঙ্গরাজের পায়ের তলা দিয়ে গোলে ঢুকে গেল। ১-৩।

এর পরেই আমার ফ্রি কিক পোস্টে লেগে ফিরে আসে। মাথা নিচু করে মাঠ ছাড়লাম। পেরুর কাছে হারতে হবে, এ-কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

(ক্রমশ)

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী

অভীক বসু

ভজনবাবু গজনবাবু
ভীষণ রকম দোস্ত
ব্যবসা নাকি রক্তে তাঁদের—
বলেন বুলি চোস্ত।
কর্মে দিয়ে ইস্তফা তাই
করেন তাঁরা চুক্তি
ফেরি করবেন রসগোল্লা
বাণিজ্যেতেই মুক্তি।
শর্ত তাঁদের পাক্কা ছিল
ছাড়তে হবে রেস্তো—
"কেউ যদি খাই কিনতে হবে,"
গজন বলে, "বেশ তো!"
মাথায় করে করেন ফেরি
কিনছে নাকো কেউ তো,
ফেরিওলা দেখে কুকুর
চেঁচায় যে ঘেউঘেউ তো।
একটি সিকি বাড়িয়ে শেষে
ভজনবাবু কন যে
"রসগোল্লা কিনছি ভায়া
পেটে ছুঁচোর ডন যে!"
একটু পরেই গজনবাবু
সেই সিকিটাই ফের-বার
এগিয়ে বলেন, "একখানি দাও
হচ্ছি খিদেয় জেরবার।"
একটি সিকিই হাত ফিরিয়ে
ভজন এবং গজন
রসগোল্লা করেন সাবাড়
ভালই কয়েক ডজন।
হিসাব-নিকাশ করেন শেষে
কার কী হল লব্ধ
ঝাড়েন পকেট, একটি শুধু
চেনা সিকির শব্দ।

ফুরফুরে হাওয়া সারা ঘর জুড়ে
যেন ফিরে আসা হিমালয় ঘুরে।

মন ভরানো ঘর ভরানো হাওয়ার জন্যে

ক্যালকাটা ফ্যান

ক্যালকাটা ফ্যান ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড

১৯বি, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৭০০০১৩

গরমের বন্ধু পাখা

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

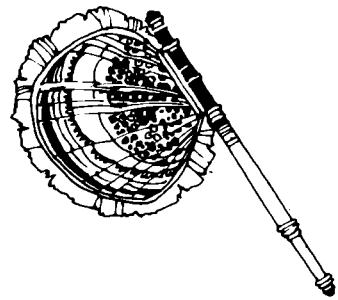

ছোটবেলায় দুপুরবেলাটা থাকতুম ঠাকুমার হেফাজতে। গরমের দুপুরে ঠাকুমা মেঝেতে শীতলপাটি বিছিয়ে শুতেন। আমরা খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইবোনেরা সবাই সূর্যের চারপাশের গ্রহ উপগ্রহের মত তাকে ঘিরে শুয়ে পড়তুম। ঠাকুরমার হাতে থাকত তালপাতার এক পাখা। তার চারদিক রঙীন কাপড় দিয়ে মোড়া থাকত যাতে বাতাস করার সময় গায়ে লাগলে ছড়ে না যায়। সেই পাখার ওপর কালি দিয়ে লেখা থাকত

তালবৃক্ষে জন্ম মোর
পাখা নাম ধরি।
পরিশ্রান্ত জনে আমি
শান্তি দান করি ॥

পাখার ওপর একথা কে লিখতেন জানি না। কিন্তু ঐ লেখাটা পড়ে সেই ছোটবেলায় এক নিঃসংগ পথিকের ছবি ফুটে উঠত আমার চোখের সামনে। সে যেন অনেক মাঠ পেরিয়ে দুপুরে অতিথি হয়েছে কোনও বাড়িতে। হাত পা ধোবার পর মাদুরে বসে পাখার হাওয়া খাচ্ছে। চোখে মুখে তৃপ্তির চিহ্ন।

আর মনে পড়ত নিঃসংগ কোনও তালগাছের কথা। যে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দাবদাহে একা মাথা উঁচু

adsyste

Badal

মিঠে হাওয়া কড়া হাওয়া
ঝোড়ো হাওয়া—
সবই বাদলের হাওয়া

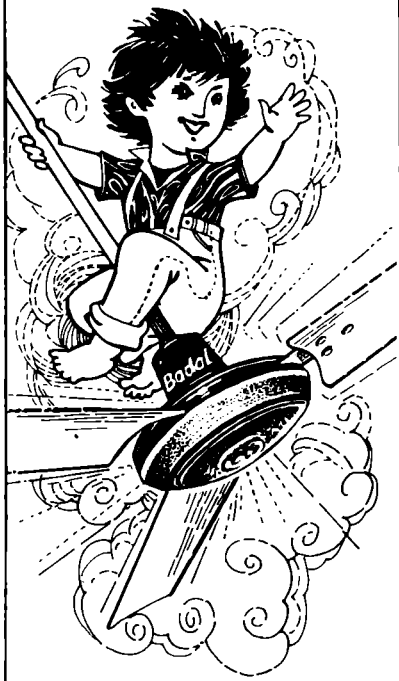

নিজের পছন্দমত
হাওয়া খেতে
বাদল পাখা
কিনুন

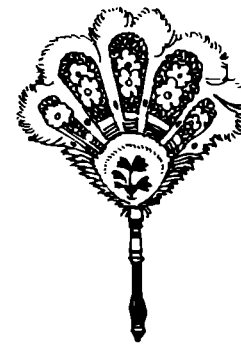

করে দাঁড়িয়ে আছে প্রান্তরের মধ্যে।

কবে কখন কোথায় তালপাতা কেটে মানুষ হাতপাখা বানাতে শিখেছিল জানি না। তবে সেটা যে বহুযুগ আগে তাতে সন্দেহ নেই। কেননা আমাদের দেশের প্রায় সর্বত্রই তালগাছ ছড়িয়ে আছে। আর এর পাতা দেখলেই মনে হয় যে পাখা হবার জন্যই তার জন্ম। একে বারে আদ্যিকালে নাকি বড় বড় লোকেরা হাওয়া খেতেন চামরের। পশুর লোম দিয়ে তৈরি। চামর দোলাবার লোক থাকত আলাদা। আমার কিন্তু মনে হয় গায়ে চামরের ছোঁয়া লাগলে সুড়সুড়ি লাগবে।

তারপর অবশ্য বিরাট বিরাট তাল পাখার ব্যবহার হত দরবারে। এখনকার দাঁড়ান-পাখার মত করে দাঁড় করিয়ে একজন সেটা নাড়াত। সে পাখার গায়েও থাকত নানা কারুকাজ।

পাখা কথাটা এসেছে সংস্কৃত পক্ষ শব্দ থেকে। পক্ষ আছে যার সে হল পক্ষী। বাংলায় পাখি। পাখির পাখায় হাওয়া খেলে। সেখানে পরপর অনেক পালক বিছান থাকে ঘন-সন্নিবদ্ধভাবে। তাই সে বাতাস সরিয়ে নিজের পথ করে নেয়। এই পাখির বাতাস সরান থেকেই বোধহয় মানুষের মনে এসেছিল পাখা তৈরির কথা—যে পাখা নাড়িয়ে সে বাতাসকে এদিক ওদিক খেলাতে পারবে। তালপাতা মধ্যে ফাঁক নেই। সংগে আছে শক্ত হাতলও। তাই এই পাতায় পাখা তৈরির কথা আমাদের দেশের লোকের মনে এসেছিল। আর্যরা পশুপালনটা জানত ভাল। তাই তারা পশুর লোম থেকে চামর বানিয়ে ছিল।

চীনদেশের গল্পকথায় বলে তারা নাকি পাঁচ

হাজার বছর আগে পাখা বানিয়ে ছিল। তাদের পাখা তৈরি হত শক্ত কাগজের বা সিল্কের কাপড়ের টুকুরো দিয়ে। এর সংগে একটা হাতল জুড়ে দেওয়া হত ধরবার সুবিধের জন্য। সেগুলোতে থাকত নানা রঙীন আলপনা। নামকরা শিল্পীরাও কখনও কখনও সেগুলো আঁকতেন। যিশুর জন্মের প্রায় ছ শো বছর পরে এই পাখা চীন থেকে প্রতিবেশী দেশ জাপানে এল। জাপানীরা আবার এটাকে গুটিয়ে রাখবার পদ্ধতি আবিষ্কার করে জিনিসটাকে আরও সহজে নাড়াচাড়ার বন্দোবস্ত করে ফেলে। এখনও ওখানকার মেয়েরা তার ব্যবহার করে। ছোট ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে নিয়ে দিব্যি চলাফেরা করা যায় এই গুটোনো পাখা।

১৮৮২ সাল মানে আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগে আমেরিকার এক ভদ্রলোক—নাম শ্যুইলার স্কাটস হুইলার (Schuyler Skaats Wheeler) বিদ্যুৎ পাখা বা ইলেকট্রিক ফ্যান বের করে ফেলেন। এতে একটা মোটর দিয়ে পাখাটা চালান হত। এই পাখা অত্যন্ত দ্রুত ঘোরে বলে বাতাস কাটেও খুব তাড়াতাড়ি।

কলকাতায় কবে বিদ্যুৎ এল ? এ সম্বন্ধে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে ইং ১৮৭৫ সাল থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যেই আধুনিক কলকাতা গড়ে ওঠা শুরু হয়েছে। অনুমান করা যায় এই কালেরই কোন এক সময়ে বিজলী বাতি জ্বলে উঠেছিল কলকাতার বুকে। বিজলী-পাখাও মনে হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই এসেছিল।

আর প্রথম স্বদেশী পাখা কোম্পানি হল ক্লাইড ফ্যান ওয়ার্কস (১৯১৮)। পরে অবশ্য এর নাম

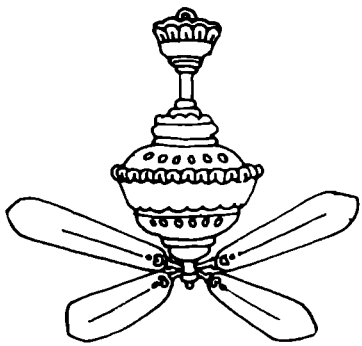

Badal

ঐদিকে যে মন পড়ে রয়
মন লাগে না কাজে

কাজ ভোলানো
হাওয়া খেতে
বাদল পাখা
কিনুন

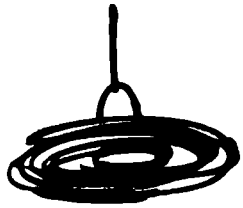

পোলার

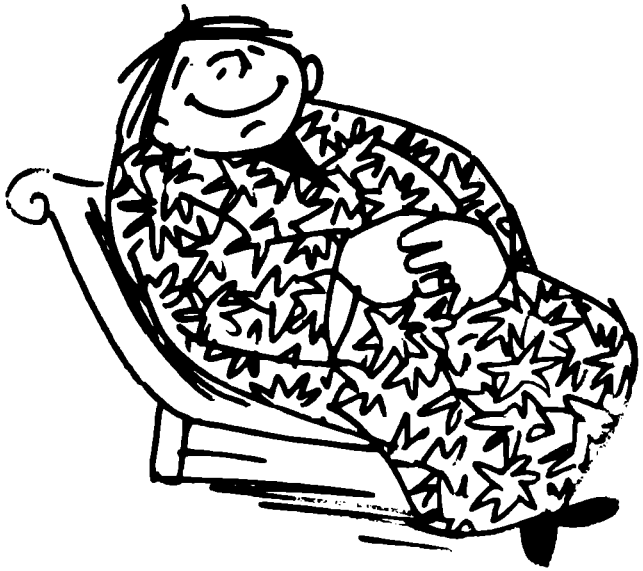

আম পাকে জাম পাকে
পাকে ফোঁড়া ঘামাচি
গরমেতে আই ঢাই
জাপানের নেগাচি।
ছিল সখা এ সহরে
নাম নাকি ফিনিচি
বলে, "দেখ হাওয়া খেতে
পোলার তো কিনিচি"॥

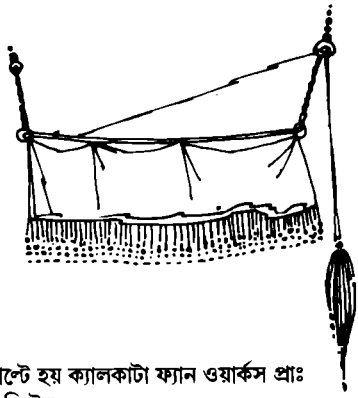

পাল্টে হয় ক্যালকাটা ফ্যান ওয়ার্কস প্রাঃ লিমিটেড ।

তার আগে আর একটা জিনিস চালু ছিল কলকাতা শহরে । তার নাম টানা পাখা । ঘরের মাথায় একটা টানা চাদরের মত পাখা লাগান থাকত । কপিকল দিয়ে তা থেকে দড়ি নেমে আসত নীচে । সেই দড়ি টানবার জন্য বহাল হত একজন মাইনে করা লোক । তাকে বলা হত পাংখাদার । সে টেনে যেত পাখা । আর বাবুরা তার তলায় বসে টানতেন অম্বুরি তামাক । গড়গড়ার নল থেকে ।

এই পাংখা টানা লোকদের স্থান ছিল ভৃত্য সমাজের একেবারে নীচের দিকে । যেখানে ভিস্তি (চামড়ার ব্যাগে করে যারা জল আনত) মাইনে পেত তিন চার টাকা এদের মাইনে ছিল চার থেকে ৫ টাকার মধ্যে । ভৃত্য সমাজের সবচেয়ে কুলীন ছিল খানসামারা । তাদের মাইনে ছিল দশ টাকা থেকে ষোল টাকা পর্যন্ত । এটা বলছি ১৮৪০ সাল নাগাদের কথা । যারা পাখা টানত তারা মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত । তখন পাখাও যেত থেমে । মালিকের ধমকে সে জেগে উঠে আবার টানতে শুরু করত পাখা । অনেক পাংখাদার আবার ঘুমতে ঘুমতে ও পাখা টানতে পারত ।

কলকাতায় বিজলী পাখা আমার বহু পরেও ইংরেজি 'ফ্যান' নামটা সরকারি কাগজপত্রে স্থান পায় নি । আমি একটি সরকারি বিদ্যালয়ে পড়তুম ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্তও সেখানে মাইনের বইতে Fan Fee বলে কিছু ছিল না । ছিল Pankha charges বলে একটি ব্যাপার ।

আজ আমরা কত রকমের পাখা দেখছি । সিলিং ফ্যান, টেবিল ফ্যান, কেবিন ফ্যান, পেডেস্টাল ফ্যান । তাছাড়া ঘরের ভেতরের

SURAJIT COMMERCIAL & ELECTRIC CO. 20 Pollock Street, Calcutta-1. Phone 26-9485

দূষিত বাতাসকে টেনে বাইরে বের করে দেবার জন্য আছে একঝস্ট ফ্যান। কারখানার মধ্যের যন্ত্রপাতিকে ঠাণ্ডা রাখার জন্যও পাখা আছে। আছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যান। আর আছে হরেক কোম্পানি। তাদের প্রত্যেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছেন একটা না একটা বিশেষত্ব নিয়ে হাজির হতে ক্রেতার কাছে। আগেকার পাখাগুলো ছিল ভারী। আজকাল বেরিয়েছে হালকা সুন্দর সুন্দর পাখা। ঘরের সৌন্দর্যও বাড়িয়ে তুলেছে এরা।

আজ ঠাকুমার সংগে শীতলপাটিতে আর কেউ শোয় না। বিজলী পাখাও এসেছে প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতে। কিন্তু তালপাতার পাখার প্রয়োজন আজও ফুরোয় নি। এই আধুনিক যুগে ও লোডশেডিং এর গরমে আমরা যখন ঘামতে থাকি

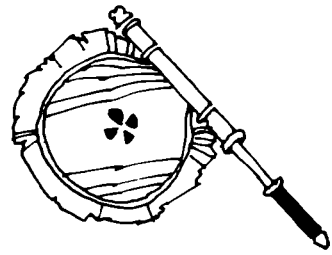

তখন সেই আদ্যিকালের পাখাই আমাদের শান্তি দান করে। নবীন আর প্রাচীনের এমন সহাবস্থান আর কোথায় পাওয়া যাবে ?

এক ভদ্রলোক দোকানে একটি ইলেকট্রিক পাখা কিনতে গেছেন। অনেক দেখে শুনে উনি একটি পাখা পছন্দ করলেন। কেনবার আগে উনি দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলেন—"পাখার সংগে ফাউ কিছু দেন না আপনারা ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। দিই তো। একটা লাঠি," বলল দোকানী,—"কেন লাঠি কেন ?"

—"লোড শেডিং এর সময় তো পাখা ঘুরবে না। তাই এই লাঠি দিয়ে সেটাকে ঘোরাতে পারবেন ॥"

জঙ্গলগড়ের চাবি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : সম্ভু মাধ্যমিকে ভাল রেজাল্ট করেছে। কিন্তু সেই আনন্দ নষ্ট হয়ে গেল একটা সাংঘাতিক ঘটনায়। ভোরবেলা পার্কে কারা যেন কাকাবাবুকে গুলি করে পালিয়ে গেল। ডাক্তারদের চেষ্টায় কাকাবাবু কোনোক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু তাঁর হাত দুটি অবশ হয়ে রইল। এখন তিনি হাঁটতেও পারেন না, নিজে খেতেও পারেন না। শরীর সারাবার জন্য ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন ওঁকে বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়া হোক। ঠিক হল পুরী যাওয়া হবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে দিল্লির এক অফিসারের নির্দেশে তাঁকে প্রথম নিয়ে যাওয়া হল গৌহাটিতে, তারপর আগরতলায়। কাকাবাবুর ব্যবহারও কেমন যেন উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে, তিনি লোকজনদের অন্য নামে ডাকেন, ভাত খাবার সময় চামচটা চিবোতে থাকেন। এক সময় তিনি বললেন যে, তাঁর নাম রামনরেশ যাদব, তিনি বিহারের একজন গোয়ালা। তারপর—

॥ ৫ ॥

প্রকাশ সরকার কাকাবাবুকে একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। তারপর সম্ভুর সঙ্গে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে নিজেদের ঘরে এসে বসল।

সম্ভুর মুখখানা শুকিয়ে গেছে একেবারে। সে যেন বুঝতে পারছে কাকাবাবুর একটা ভীষণ বিপদ আসছে। এই অবস্থায় বাড়ি থেকে এত দূরে থাকা কি ঠিক?

প্রকাশ জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার হল বলো তো, সম্ভু? উনি একবার বৈজনাথ বলে ডাকলেন আমাকে। তারপর নিজের নাম বললেন রামনরেশ যাদব। এরা কারা?"

সম্ভু বলল, "কোনোদিন আমি এই সব নাম শুনিনি!"

"তুমি তো ওঁর সঙ্গে সবকটা অভিযানেই গেছ, তাই না? সুতরাং যে-সব ব্যাড ক্যারেকটারদের উনি দেখেছেন, তুমিও তাদের দেখেছ?"

"তার কোনো মানে নেই। আমি তো মোটে চার-পাঁচ বার গেছি কাকাবাবুর সঙ্গে। তার আগে কাকাবাবু আরও কত জায়গায় গেছেন। পা'টা ভেঙে যাবার আগে তো উনি আমাকে সঙ্গে নিতেন না!"

"আগেকার কথা বাদ দাও। গত পাঁচ-ছ' বছর ধরে তো তুমি ওঁর সঙ্গেই থেকেছ—"

একটু চিন্তা করে সম্ভু বলল, "না, তাও ঠিক বলা যায় না। গত বছর আমার যখন পরীক্ষা ছিল, সেই সময় কাকাবাবু একাই যেন কোথায় গিয়েছিলেন··· "

"কোথায়?"

"তা আমি ঠিক জানি না। তবে মনে হয় যেন আসামের দিকেই!"

"কেন তোমার আসামের কথা মনে হল? উনি কি তোমায় কিছু বলেছিলেন?"

"না। তা বলেননি। তবে, উনি মা'র জন্য একটা বেশ সুন্দর নানারঙের কম্বলের মতন জিনিস এনেছিলেন তার নাম খেস্। মা বলেছিলেন, ঐ জিনিস আসামেই ভাল পাওয়া যায়।"

"কিন্তু আসামে এসে বৈজনাথ কিংবা রামনরেশ যাদব টাইপের নামের ক্যারেকটারদের উনি মিট করবেন, এটা ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় না। বিহার, উত্তরপ্রদেশেই এই ধরনের নামের লোক থাকে।"

"আচ্ছা ডাক্তারবাবু—"

"আমায় ডাক্তারবাবু বলার দরকার নেই। আমায় তুমি প্রকাশদা বলতে পারো।"

"আপনার কি মনে হয়, কাকাবাবুর স্মৃতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে?"

"কিছু একটা গন্ডগোল যে হয়েছে, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। উনি নিজেকেও অন্য মানুষ ভাবছেন। অবশ্য এটা খুব টেমপোরারিও হতে পারে। দেখা যাক, কাল সকালে কেমন থাকেন।"

"আপনি সত্যি করে বলুন, কাকাবাবু আবার

ভাল হয়ে যাবেন তো ?"

"নিশ্চয়ই ! যে-কোনো ভাবেই হোক, ওঁকে ভাল করে তুলতেই হবে। ওঁর মাথাটাই তো একটা অ্যাসেট। তা হলে এবার শুয়ে পড়া যাক ?"

পাশাপাশি দুটো খাটে ওদের বিছানা। মাঝখানে একটা টেব্‌ল ল্যাম্প। প্রকাশ সরকার সেই আলো নিভিয়ে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু সন্তুর ঘুম আসছে না। সে আকাশ-পাতাল ভাবছে শুধু। কাকাবাবুর কথা মনে করলেই তার কান্না এসে যাচ্ছে। কাকাবাবু যদি পাগল হয়ে যান ? না, না, তা হতেই পারে না ! কাকাবাবুর মতন সাহসী মানুষ এরকমভাবে নষ্ট হয়ে যাবেন ?

যদি সত্যি-সত্যি কাকাবাবুর কিছু হয়, তা হলে সন্তু ছাড়বে না। যারা কাকাবাবুকে ঘুমের গুলি দিয়ে মেরেছে, তাদের সন্তু দেখে নেবে। যদি তারা পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়েও লুকোয়, তা হলেও সন্তু প্রতিশোধ নেবেই।

কিন্তু তারা কারা ?

কাপুরুষের মতন তারা কাকাবাবুকে পেছন থেকে গুলি করে পালিয়েছে। কাকাবাবুকে তারা পুরোপুরি মেরে ফেলতেও চায়নি, শুধু তাঁর মাথাটাকে নষ্ট করে দিতে চেয়েছে। এটা তো মৃত্যুর চেয়েও খারাপ।

এই সব ভাবতে-ভাবতে কত রাত হয়ে গেছে তার ঠিক নেই। একটু বোধহয় তন্দ্রার মতন এসেছিল, হঠাৎ একটা আওয়াজে চমকে উঠল সন্তু।

একটা গাড়ি ঢুকেছে কম্পাউন্ডের মধ্যে। ইঞ্জিনের শব্দটা খুব জোর। কয়েকজন লোকের কথাও শোনা গেল এর পরে।

সন্তু তড়াক করে খাট থেকে এসে দাঁড়াল জানালার পাশে।

সার্কিট হাউসের বারান্দার আলো সারা রাত জ্বালাই থাকে। সেই আলোয় দেখা গেল, একটা জোঙ্গা জিপ এসে দাঁড়িয়েছে, তার থেকে দু'তিন জন লোক নেমে কথা বলছে নাইট গার্ডের সঙ্গে।

তাদের মধ্যে একজন লোক এগিয়ে এল এদিকে। ঠিক যেন সন্তুর সঙ্গে কথা বলতেই আসছে। সোজা এসে তারপর লোকটি কিন্তু

"ঝপাৎ"

সোমনাথের বাড়িতে সেদিন কেলেঙ্কারীর একশেষ। বরাবরের মত সেদিনও সোমনাথের মা রান্নাঘরের জঞ্জালগুলো একটা ঠোঙায় ভরে ছুঁড়েছেন রাস্তায়। আর পড়বি তো পড় সোমনাথের বাবার গায়ে গিয়ে ফাটলো ঠোঙাটা। ডিমের খোলা, মাছের আঁশ, চুল আর গুচ্ছের নোংরা মেখে বাবা যখন ঘরে ঢুকলেন, তখন লজ্জায় সকলের মাথা হেঁট।

কেলেঙ্কারীটা হতে তবে সকলের টনক নড়লো। আর এ বদ অভ্যেস তো কলকাতার ঘরে ঘরে "বাবার ঘটনাটা থেকেই যদি সকলের শিক্ষা হয়ে যেতো-?" সোমনাথ ভাবছিল।

(সি.এম.ডি.এ জনসংযোগ বিভাগ.৩এ,অকল্যান্ড প্লেস,কলকাতা-১৭ কর্তৃক প্রচারিত)

সরোজ রায়

চলে গেল পাশের ঘরের দিকে।

সন্তুর তক্ষুনি মনে পড়ল কাকাবাবুর ঘরের দরজা খোলা আছে। কারণ, কাকাবাবু তো নিজে দরজা বন্ধ করতে পারবেন না, দরজাটা ভেজিয়ে রাখা হয়েছিল। ঐ লোকটা কাকাবাবুর ঘরের দিকেই গেল।

প্রকাশ সরকারকে ডাকবারও সময় পেল না সন্তু। সে অন্ধকারেই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

ঠিক যা ভেবেছিল তাই। লোকটা নেই। কাকাবাবুর ঘরের একটা পাল্লা খোলা।

সন্তু সেই দরজার কাছে আসতেই তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার। সঙ্গে-সঙ্গে মাটিতে বসে পড়ল সন্তু। তার ধারণা হল, এইবার কেউ তাকে গুলি করবে।

কিন্তু সেরকম গুলি ছুটে এল না।

তার বদলে একজন কেউ কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, "কে?"

মানুষের গলার আওয়াজ শুনে অনেকটা ভয় কেটে যায়। সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনি কে? আমাদের ঘরে ঢুকেছেন কেন?"

লোকটি কোনো উত্তর না দিয়ে টর্চের আলোটা ঘুরিয়ে ফেলল খাটের ওপর কাকাবাবুর মুখের ওপর।

ততক্ষণে সন্তু দরজার পাশের সুইচ টিপে আলো জ্বেলে ফেলেছে।

কালো রঙের প্যান্ট ও কালো ফুলশার্ট পরা একজন ঢ্যাঙা লোক ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা চৌকো বড় টর্চ। সন্তু আগে কোনো লোককে এরকম টর্চ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেনি।

লোকটা বলল, "এই চার নম্বর ঘর আমাদের নামে বুক করা ছিল। নাইট গার্ড বলল, আমাদের রিজার্ভেশান ক্যানসেল্‌ড হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস হয়নি। এখন দেখছি, সত্যি এখানে একজন লোক শুয়ে আছে।"

প্রকাশ সরকারও এর মধ্যে উঠে এসেছে।

সে বলল, "আপনি কে? কিছু জিজ্ঞেস না-করে হুট করে এ-ঘরে ঢুকে এসেছেন কেন?"

লোকটি বলল, "কেন, তাতে কী হয়েছে? এ ঘর আমাদের নামে বুকিং... "

প্রকাশ বলল, "তা হতেই পারে না। একই ঘর কখনো দু' জনের নামে বুক হয়? আপনার বুকিং আছে কি না তা আপনি অফিসে গিয়ে খোঁজ করুন।"

লোকটি বলল, "আপনারা যখন শুয়ে পড়েছেন, তখন আপনাদের এখন এখান থেকে তুলে দেব না নিশ্চয়ই। দেখি অন্য কী ব্যবস্থা করা যায়!"

সন্তু আর প্রকাশকে পাশ কাটিয়ে লোকটা চলে গেল বাইরে।

প্রকাশ কাকাবাবুর কাছে এসে একটা চোখের পাতায় সামান্য আঙুল ছুঁয়ে বলল, "উনি অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, কিছুই টের পাননি। তা হলেও...এত রাত্রে একটা লোক হুট করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বে... "

সন্তু বলল, "ওরা দেখে গেল।"

প্রকাশ বলল, "ওরা মানে?"

সন্তু বলল, "যাদের চোখে ধুলো দেবার জন্য প্রথমে গৌহাটি যাওয়া হল, তারপর আগরতলায়—সেই তারাই এসে দেখে গেল কাকাবাবু এখানেই এসেছেন কি না!"

প্রকাশ হেসে বলল, "আরে না, না। ও লোকটা একটা উটকো লোক। ওদের বুকিংয়ে বোধহয় কিছু গোলমাল হয়েছে। তাছাড়া, আমরা তো ঠিক কারুর চোখে ধুলো দিতে চাইনি, এমনিই সাবধানতার জন্য... "

"কিন্তু যে-লোকটা এই ঘরে ঢুকেছিল, সেই লোকটা মোটেই ভাল না।"

"নিখুঁত পরিষ্কার"

"হুইল যে কি জিনিষ, আমার বৌমাটি তো তা জানতোই না। এইসব নতুনের দলেদের কি আর বলব, এখনও সেই পুরোনপন্থী হয়েই রয়েছে! হুইল-এ যে কত সাশ্রয় হয় তা ওকে বোঝালাম—আর এও বললাম যে, প্রতিটি বার-এ চারটি ক'রে ভাগ থাকে। আর তারপর ও এই বিপুল ফেনার রাশি আর কাপড়ের সমস্ত ময়লা ধুয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে তো একেবারে অবাক! হুইল-এ কাপড় কাচলে কাপড় পরিষ্কারও হয় সাবানের চেয়ে বেশী আর কাপড় ধোয়াও যায় অনেক বেশী! তাই তো এখন হুইল-এর ওপর ওর দারুণ বিশ্বাস জন্মে গেছে—সাবানের আর দরকারটাই বা কি বলুন তো?"

হুইল

দারুণ ধোলাই শক্তি- চড়া দাম থেকে মুক্তি!

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-WL.12-1810 BG

"তুমি কী করে বুঝলে ?"

"ও কালো প্যান্ট আর কালো শার্ট পরেছিল। আমি কালো রঙের জামা পরা লোক আগে দেখিনি।"

"ওঃ-হো ! এই জন্য। ঠিক কালো নয় তো, খুব গাঢ় খয়েরি। একরঙের প্যান্ট শার্ট পরা আজকাল ফ্যাশান হয়েছে।"

"ঐ রকম চৌকো টর্চ··· "

"গোল আর লম্বা টর্চ হাতে থাকলেই লোকটা ভাল হয়ে যেত ?"

"লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলে।"

"তোমার দেখছি বড্ড বেশি বেশি সন্দেহ। শোনো, আমরা যে আজ আগরতলায় এসেছি, তা বাইরের কারুর পক্ষে জানা অসম্ভব।"

"কেন, আমরা কি এখানে মিথ্যে নাম লিখিয়েছি ? সার্কিট হাউসের লোকেরা তো জানে। যাই বলুন, ঐ লোকটার মুখ দেখে মনে হল, ও কাকাবাবুকে চিনতে পেরেছে।"

"যাঃ, কী যে বলো ! কাল সকালেই আমি খবর নেব ওরা কারা। এখন চলো, শুয়ে পড়া যাক।"

"আমি কাকাবাবুর সঙ্গে এ-ঘরেই শোব। প্রথম থেকেই আমার তাই করা উচিত ছিল। আপনি বললেন বলে পাশের ঘরে চলে গেলুম।"

"বেশ তো, থাকো না।"

সন্তু চট করে পাশের ঘর থেকে জামা-কাপড় নিয়ে এল। এ-ঘরেও দুটো খাট। কাকাবাবুর পাশের খাটে কিছু জিনিসপত্র রাখা ছিল, সেগুলো নামিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল সন্তু।

এবারেও তার ঘুম আসতে অনেক দেরি হল। তার বার-বার মনে হচ্ছে, ঐ লম্বা লোকটা জোরালো টর্চ নিয়ে কাকাবাবুকে দেখতেই এসেছিল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সন্তু এসে পড়ায় কাকাবাবুর কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।

সার্কিট হাউসে জায়গা না পেয়ে ওদের জোঙ্গা জিপটা একটু আগেই চলে গেছে। তা যাক। ওরা যদি শত্রুপক্ষের লোক হয়, তা হলে একজনের চেহারা তো সন্তুর জানা রইল। কাকাবাবুর কোনো ক্ষতি হলে ঐ লোকটাকে সন্তু ঠিক খুঁজে বার করবেই।

পরদিন সন্তুর ঘুম ভাঙল অনেক দেরিতে। দরজায় ঠকঠক শব্দ হচ্ছে।

সন্তু ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল, উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। একজন বেয়ারা চা নিয়ে এসেছে।

কাকাবাবু জেগে উঠেছেন এর মধ্যেই। চোখ মেলে ঘরের ছাদ দেখছেন।

সন্তু কাছে গিয়ে বলল, "কাকাবাবু, চা খাবেন ?"

কাকাবাবু কোনো উত্তর না দিয়ে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন সন্তুর দিকে। কেমন যেন ঘোলাটে দৃষ্টি।

সন্তু কাকাবাবুর মাথার পেছনে হাত দিয়ে তাঁকে আস্তে-আস্তে বসিয়ে দিল। তারপর কাপে চা ঢেলে নিয়ে এল কাকাবাবুর মুখের সামনে।

কাকাবাবু একটা চুমুক দিলেন।

তারপর অদ্ভুত খসখসে গলায় বললেন, "এটা চা নয়। ষাঁড়ের রক্ত। এ জিনিস বাঘে খায়, মানুষে খায় না।"

সন্তু বলল, "চা-টা ভাল হয়নি বুঝি ? আচ্ছা, আমি আবার অন্য চা দিতে বলছি।"

পেছন ফিরে সন্তু সেই চায়ের কাপে নিজে একটা চুমুক দিয়ে দেখল। তার তো কিছু খারাপ লাগল না।

কাকাবাবু আবার বললেন, "আজ কি ফেব্রুয়ারি মাসের তিন তারিখ ?"

সন্তু বলল, "না তো ! এখন তো জুন মাস, আজ আট তারিখ।"

কাকাবাবু বললেন, "এলতলা বেলতলা, কে এল আগরতলা ?"

সন্তু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "কী বললেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, হরিণ বলে কোথায় যাই !"

সন্তুর আবার ভয় করতে লাগল। কাকাবাবু ভুল বকতে শুরু করেছেন। এক্ষুনি প্রকাশ সরকারকে ডাকা দরকার।

সে চলে গেল পাশের ঘরে। সে-ঘর ফাঁকা। প্রকাশ নেই। বাথরুমেও নেই। বাইরে উঁকি দিয়েও দেখা গেল না। সকালবেলা সে কোথায় চলে গেল ?

অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না প্রকাশ সরকারকে। (ক্রমশ)

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

বাঘা

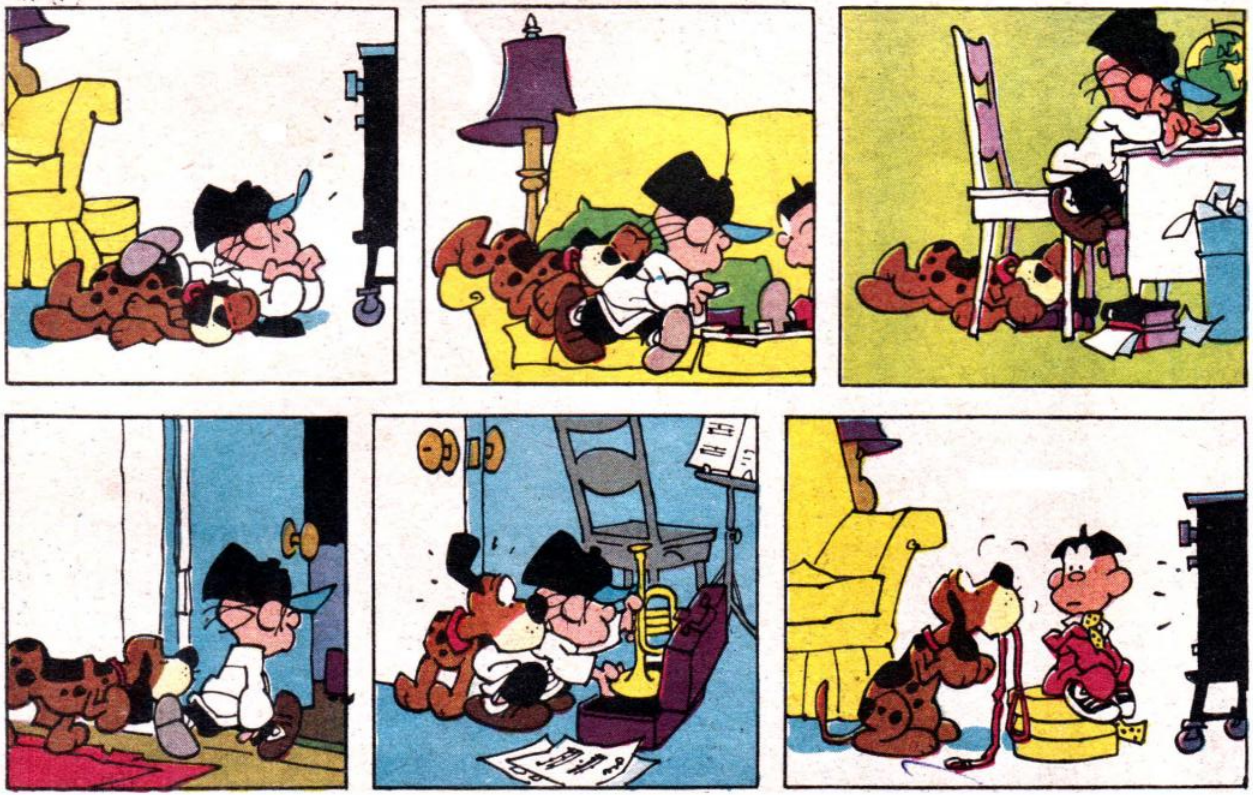

আঁকো

ডিম থেকে মাথা

এমনভাবেই ঠিক-ঠিক রেখার টানে মুখের গোটা আদলটা কেমন পরিষ্কার হয়ে উঠছে লক্ষ করবে। প্রথম থেকে এ-পর্যন্ত সব নকশাগুলো কাছে নিয়ে দ্যাখো কেমনভাবে ধাপে ধাপে খোঁপা-বাঁধা মেয়েটিকে ছবির ভেতর পেলে। এবার তোমার খুশিমতো ছেলে বা মেয়ের মুখ আঁকতে আটকাবে না।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

শেখো

তারের খেলনা—৩

এ-কাজের জন্য যা যোগাড় করেছ তাই দিয়েই আরম্ভ করা যেতে পারে। কেবল কখনও কাপড় জামা কাগজের করতে গেলে ক্রেপ পেপার ভাল।

শুরু করো—এবারে নমুনায় জন্তু-জানোয়ারের ছবি দেখছ। ঠিক-ঠিক যেমনভাবে আগে তারকে ভাঁজ করে নিজের নকশায় এনেছ এবারও সেইভাবে করো। কেবল লক্ষ করো ১নং ছবির জানোয়ারের সঙ্গে ২ নম্বরের আকারগত তফাত ছাড়াও উল লাগানোয় তফাত আছে। ২নং ছবিতে গায়ের লোমগুলি ঝোলা-ঝোলা করার জন্য সেভাবে উল লাগানো হয়েছে।

জেনে রাখো—(১) উলের বদলে কাপড় লাগাতে বাধা নেই। (২) কাপড় বা উল যাতে ঠিকভাবে লাগে তার জন্যও তারে সামান্য আঠা মাখিয়ে নিলে সুবিধে, কিন্তু তাতে প্রয়োজনে বার বার খোলা বা পরানো যাবে না (৩) যত্ন করে না করলে দেখতে নোংরা লাগবে। (৪) সব কাজের মতো এরও পরিচ্ছন্নতা দরকার।

কারিগর

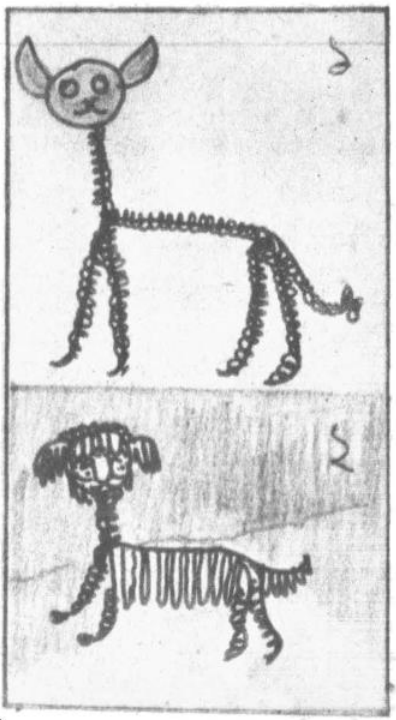

নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস...
সুস্থ সবল দাঁত

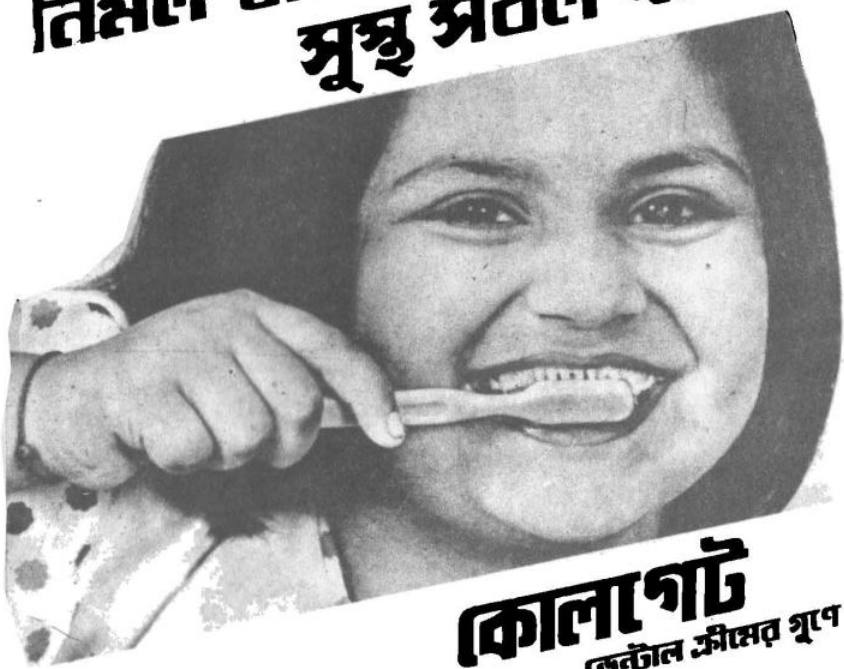

কোলগেট
ডেন্টাল ক্রীমের গুণে

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কোলগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিষ্টি স্বাদ রয়েছে যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছা করবেই।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমুলা কি ভাবে কাজ করে!

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দু'ইই দূর করে।

ফলাফলঃ সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস ও দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

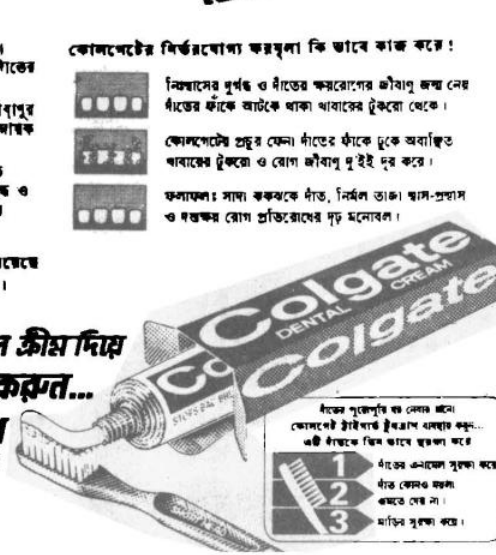

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

C.G.74 BN

প্রকৃতির এক নতুন আবিষ্কার।

আপনার রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে
...প্রকৃতির নিজস্ব কোমল পদ্ধতিতে!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী — বিজ্ঞানের এক অভিনব আবিষ্কার—এ এমন এক রঙ ফর্সা করার ক্রীম, যা দুভাবে কাজ করে।

ত্বককে ভেতর থেকে : ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী-র বিশেষ উপাদানগুলি, আপনার ত্বকে ময়লা হওয়ার প্রভাব কম ক'রে দিয়ে, রঙ এমন ফর্সা ক'রে তোলে যা নজরে পড়ে।

ত্বককে বাইরে থেকে : এর বিশেষ 'রোদ এড়ানোর পর্দা' আপনার ত্বককে রোদে পোড়ার হাত থেকে রক্ষা করে, অথচ, ত্বক সূর্য্যকিরণের সমস্ত স্বাস্থ্যকর গুণ শুষে নিতে পারে।

৬ সপ্তাহ ধরে নিয়মিত মাখলে, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী আপনার রঙ কী ফর্সাই না ক'রে তুলবে— যা আপনি সবসময় চেয়ে এসেছেন।

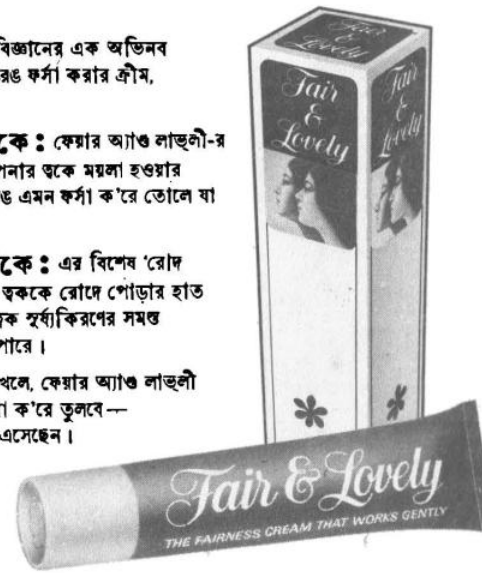

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী—ফর্সা হবার কোমল উপায়!

হিন্দুস্থান লিভারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS-FA' OV I3, 1810 BG